গীতানুবচন

দ্বিতীয় খণ্ড

অনির্বাণ

সারস্বত গ্রন্থাবলী সংখ্যা—১৩৮

গীতানুবচন

দ্বিতীয় খণ্ড

অনির্বাণ

নিবেদন

জগদ্‌গুরু স্বয়ং ভগবানের মঙ্গলেচ্ছায় গীতানু-বচনের দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় ষট্‌ক) প্রকাশিত হইল। আশা করি প্রথম ষট্‌কের মত, দ্বিতীয় ষট্‌কের প্রশ্ন এবং উত্তরও জিজ্ঞাসুদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া, গীতার রহস্যার্থ হৃদয়ঙ্গমে সহায়তা করিবে। আচার্য শ্রীমৎ অনির্বাণজীর অনুগ্রহ হইলে শীঘ্রই তৃতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হইবে।

ঋতম্ভরা
৫২, ঠাকুরবাটী ষ্ট্রীট
পোঃ শ্রীরামপুর, জিঃ হুগলী

স্বামী সত্যানন্দ

প্রশ্ন ঃ সত্য

উত্তর ঃ অনির্বাণ

গীতানুবচন

প্রশ্ন

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে সমগ্রভাবে 'আমাকে' জানিবার কথা বলিয়াছেন ভগবান। 'সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু' (৭।১)। 'সবিজ্ঞান' তাঁহাকে জানিলে কি আর জ্ঞাতব্য থাকে না? অনন্তকে জানিয়া তো শেষ করা যায় না, তবে 'জ্ঞাতব্য আর থাকে না' একথা বলিলেন কেন? 'যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে' (৭।২)। জ্ঞান বিজ্ঞান সবিজ্ঞান—এই তিনটি ভগবদ্‌বাক্যের রহস্য কি?

উত্তর

গীতার প্রথম ষট্‌কে ছিল আত্মজ্ঞানের উপদেশ, তাতে রাজযোগ আর তার অন্তর্গত ক্রিয়াযোগ দুয়ের কথাই ছিল। নিজেকে জানলে তবে ভগবানকে জানা যায়, তাঁর প্রতি ভক্তি হয়। ভক্ত যোগীই যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (৬।৪৭)।

এ-কথার পর অর্জুন আর কোনও প্রশ্ন তোলেননি। আত্মজ্ঞান এবং তাহতে ভগবদ্‌ভক্তি আর সেই ভক্তিতে তাঁকে নিজের মধ্যে পাওয়া—একেই সাধনার কৃতকৃত্যতা বলে মনে করতে পারি। কিন্তু এতে তাঁকে আমরা জানলাম এবং পেলাম নিজের মধ্যেই—বিশ্ব-প্রকৃতিতে তো নয়। তাই এ-জ্ঞান উচ্চকোটির হলেও অসমগ্র। দ্বিতীয় ষট্‌কের গোড়াতে তাই তার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য ভগবান জিজ্ঞাসিত না হয়েও অর্জুনের জ্ঞানযোগকে উত্তীর্ণ করতে চাইলেন বিজ্ঞানযোগে।

বিজ্ঞান মানে বিশিষ্ট জ্ঞান এবং বিচিত্রের জ্ঞান দুই-ই হয়। নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে আমরা তাঁকে যে জানি, সে-জ্ঞান ব্যাবহারিক জগতের ধাক্কা সইতে পারে না সবসময়। তাই জ্ঞানকে পাকা করবার জন্য ব্যুত্থানেও সমাধিপ্রবর্তনের একটা আবশ্যকতা আছে। অর্জুন যে এটার আভাস পেয়েছিলেন, তা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর 'স্থিতপ্রজ্ঞের সংজ্ঞা কি'—এই প্রশ্নেই বোঝা গিয়েছিল (২।৫৪)। কিন্তু সেখানেও দেখছি, স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মরত, ভক্তি ও ভগবান সেখানে অন্তশ্চর। দ্বিতীয় ষট্‌কে আত্মজ্ঞান উত্তীর্ণ হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানে, ত্বং-তত্ত্বের পরিশোধনে তৎ-তত্ত্বের জ্ঞান সম্ভাবিত হচ্ছে, আত্মা ব্রহ্মে বিস্ফারিত হবার সুযোগ পাচ্ছে। জ্ঞান তাহলে আত্মার জ্ঞান—নিজেকে জানা এবং সেই জানায় তাঁকে নিজের মধ্যে পাওয়া। তাঁকে বিশ্বচরাচরে পাওয়া এবং সেইসঙ্গে নিজেকেও বৃহৎ করে পাওয়া হল বিজ্ঞান বা জ্ঞানের সমগ্রতা। তিনি আমাতে আছেন—এইটি জ্ঞান; আবার তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছেন—এইটি বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানে আত্মজ্ঞানের পরিপাক হয়।

লক্ষ্য করো, এই বিজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই ভগবান প্রকৃতির কথা তুলছেন। এ-প্রসঙ্গ তো আগে ওঠেনি। আত্মজ্ঞানের সাধনায় আত্মপ্রকৃতির একটা সামান্যত জ্ঞান দরকার হয়। সেটা 'ভগবানের' অপরা প্রকৃতিরই জ্ঞান, তাঁর পরা-প্রকৃতির জ্ঞান নয়। এই পরা-প্রকৃতির জ্ঞান গীতার একটি বৈশিষ্ট্য। এ-ও জ্ঞানের পর বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে বিভূতির কিছুটা আভাস দিয়েছেন—যার বিস্তার আমরা পাব দশম আর একাদশ অধ্যায়ে। এতেও তাঁকে 'সমগ্রভাবে' জানার সঙ্কেত পাচ্ছি।

এই সমগ্রজ্ঞান বা বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা কি, তা সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ইঙ্গিত করে অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তার করে বলা হয়েছে (৭।২৯-৩০)।

জ্ঞানের শেষ নাই, তাঁকে কেউ নিঃশেষে জানতে পারে না। কিন্তু সমুদ্রে ঘট ডুবে গেলে সে তো ভরে যায়, তার আর তখন কিছু পাবার থাকে না। তেমনি তাঁর বিশুদ্ধ জ্ঞান অনন্তের ব্যঞ্জনা নিয়ে যখন আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়, তখন অনুভব হয়—আমার আর-কিছু জানবার বাকী রইল না, অথচ আমার ভরা ঘট ঘিরে অসীম সমুদ্র থৈ থৈ করছে।

প্রশ্ন

'কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ' (৭।৩)—কথাটির তাৎপর্য কি? তত্ত্বত শব্দটি শুনিলেই তাহার বিপরীত অতত্ত্বত কথাটির ভাবও মনে জাগে। জীবভূতা পরা-প্রকৃতি তো ঈশ্বরের? 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ', 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং' (৭।৭)—এই 'মত্তঃ' এবং 'ময়ি' বলিতে ভগবানকে, না তাঁহারই পরা-প্রকৃতিকে বোঝায়? পরা-প্রকৃতিতেই তো জগৎ বিধৃত, আমিও বিধৃত। ভগবান এবং পরা-প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক বা সম্বন্ধটা কি? ভগবান তো পরা-প্রকৃতির ঊর্ধ্বে? পরা-প্রকৃতিরূপ সূত্রেই তো সব গ্রথিত?

উত্তর

মানুষের বেলায় তত্ত্বজ্ঞান হল স্বরূপের জ্ঞান—সে বস্তুত যা তার জ্ঞান। কিন্তু ভগবানের বেলায় তাঁর তত্ত্বজ্ঞান হল তাঁর স্বরূপ এবং প্রকৃতি—দুয়েরই জ্ঞান। দুই-ই তাঁর তত্ত্ব। স্বরূপ তত্ত্ব, আর প্রকৃতি বা বিভূতি অতত্ত্ব—তা নয়।

তাঁর প্রকৃতি বস্তুত ত্রিধা—অপরা পরা এবং পরমা। অপরা প্রকৃতি হল সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি—এখানে সংক্ষেপে অষ্টধা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা ভূমি অপ্ ইত্যাদি এখানে উপলক্ষণ মাত্র। যেমন পঞ্চ ভূত; তেমনি পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই সবই ওই মৌল ভূতেরই ক্রমিক উৎকর্ষ। এরও পরে আরেকটি পঞ্চক আছে—মন অহংকার বুদ্ধি প্রকৃতি এবং ঈশ্বর।

ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি ছাড়া আছে 'জীবভূতা' পরা প্রকৃতি। জীব হচ্ছে তাঁর সনাতন 'অংশ' (১৫।৭) কি-না অংশু অর্থাৎ

সূর্যরশ্মির মত একটি রশ্মি। বেদে এই অংশ সপ্ত আদিত্যের এক আদিত্য। 'অংশ' খণ্ডকে বোঝায় না। জীব অংশু, এক অংশুর সঙ্গে আরেক অংশুর বিরোধ নাই, প্রত্যেক অংশুই ব্যাপ্তিধর্মা, সমস্ত অংশুর সমাহারে ঈশ্বর 'জীবঘন' আদিত্যস্বরূপ—এসব ভাব বেদে ও উপনিষদে আছে। তাঁর এই বহুধা বিকিরণের শক্তিই তাঁর পরা-প্রকৃতি। তা-ই বিশ্বযোনি, যাতে তিনি বীজপ্রদ পিতা (১৪।৪)। একদিকে এই পরা প্রকৃতি যেমন জীবভূতা, তেমনি আরেক দিকে আবার 'মহদ্ ব্রহ্ম' (১৪।৩)।

এছাড়াও আছে তাঁর 'স্বা প্রকৃতি'তে নিত্যসঙ্গত আত্মমায়া (৪।৬)। এই হল তাঁর পরমা প্রকৃতি। এর আরেক নাম যোগমায়া (৭।২৫) অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্তা মায়া।

এই প্রকৃতি উন্মেষদশায় সম্ভূতি এবং নিমেষদশায় অসম্ভূতি। শেষেরটি তন্ত্রের কুমারী তত্ত্ব, বেদে যাকে 'বশা' বা বন্ধ্যা গাভীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

তাঁর পরমা প্রকৃতি অসম্ভূতি-সম্ভূতি শক্তি, পরা প্রকৃতি বিভূতি শক্তি। আর অপরা প্রকৃতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে আবর্তিত যান্ত্রিক শক্তি।

এখানে 'মত্তঃ' এবং 'ময়ি' বলতে পুরুষকে ভগবানকে পিতাকে বোঝাচ্ছে।

প্রশ্ন

'ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ' (৭।১১)—গীতার এই বাণীর রহস্যার্থ কি? ধর্মের অবিরোধী কাম বা কামনা কি? এ সম্পর্কে বিধান-দাতা কে? কামরাগবিবর্জিত বল বলিতেই বা কি বোঝায়?

উত্তর

কামের দুটি বৃত্তি—একটি বুভুক্ষা বা ভোগেচ্ছা, আরেকটি সিসৃক্ষা বা সৃষ্টির ইচ্ছা। দুটি বৃত্তিরই আদিমরূপ আছে। সৃষ্টি যখন আত্ম-

বিসৃষ্টি, গাছের মত ফুল ফোটানো, যাকে বেদে বলা হয়েছে তাঁর বহু হয়ে প্রজাত হওয়া (তু. তদৈক্ষত অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়), তখন তা আদিকাম। বেদে একে বলা হয়েছে 'মনসো রেতঃ প্রথমং য়দাসীৎ'। এটিই পরমপুরুষের সৃষ্টির প্রবেগ, তাঁর আত্মশক্তির বিচ্ছুরণ। এই বিসৃষ্টিতে তাঁর যে-উল্লাস তা আত্মতর্পণ, তা-ও কাম। সে-কামের নাম আত্মারামতা।

আত্মারামতা এবং আত্মবিসৃষ্টি কামের আদিরূপ। এইটিই যথার্থ ধর্মাবিরুদ্ধ কাম। তাতে আত্মবিসৃষ্টির রাস টেনে রাখে আত্মারামতা।

এই কামশক্তি জীবের বেলায় নিয়োজিত হয়েছে জীবসৃষ্টির তাগিদে। তখন তার নাম 'রিরংসা' বা মূঢ় রমণেচ্ছা, তা থেকে প্রজনন (procreation)। মানুষ প্রকৃতির তাড়নায় এই রিরংসার বশ হয়ে পড়ে, তখন তার স্বরূপ আবৃত হয়ে যায়। যেমন ধোঁয়ায় আগুন ঢাকা পড়ে। এই কাম অধর্ম। গীতায় একে বলা হয়েছে 'প্রজন কন্দর্প' (প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ ১০।২৮)।

এই কাম স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে ধর্মের শাসনে রাখতে হবে। ধর্ম বিবেকে, প্রকৃতি হতে পুরুষের ঊর্ধ্বস্থিতিতে। অধর্ম অবিবেকে —প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের একাকার হয়ে যাওয়ায়। প্রজন কন্দর্পের শাসনে মানুষের তা-ই হয়।

গীতায় কামের তিনটি অধিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে—ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধি। 'ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে' (৩।৪০)। প্রজন কন্দর্প ইন্দ্রিয়গত কাম। কাম্য বিষয় তখন আমার বাইরে। যদি ওতেই তলিয়ে যাই, তাহলে সে-কাম হবে অধর্ম।

কিন্তু বাইরের বিষয়কে যদি ভিতরে টেনে রাখতে পারি, বস্তুগত রসকে যদি ভাবরসে রূপান্তরিত করতে পারি, তাহলে কামবৃত্তির ঊর্ধ্বায়ন ঘটে। কাম তখন হয় মনোগত।

মনোগত কাম যখন আরও গভীর ও ঊর্ধ্বায়িত হয়ে বিশ্বব্যাপ্ত হয়, তখন তা বুদ্ধিগত কাম। এই কাম জীবের বেলায় ধর্মাবিরুদ্ধ কাম।

আদিকাম তাহতে আরেক ধাপ উঁচুতে মাত্র।

কামের এই উর্ধ্বায়নের বিধাতা হলেন আমার অন্তর্যামী। আমরা অধর্ম হতে ধর্মের দিকে উজিয়ে যাব, এই তাঁর শাশ্বত বিশ্ববিধান।

কাম এবং রাগ একই বিষয়ের এপিঠ-ওপিঠ। রাগের মূল কথা হল ভাললাগা। যা ভাল লাগে, তা আমাদের মনে রং ধরায়, আমরা তাকে ছাড়তে চাই না। চিত্তের এই ছোপলাগা ভাবটা হল রাগ।

রাগের বস্তু সবসময় পাওয়া যায় না। তখন তার জন্য মন যদি ছট্‌ফট্ করতে থাকে, তাহলে তা হল কাম। এ-কাম রাগের তৃপ্তিকে খোঁজে বাইরে।

রাগ হতে কাম এবং তা হতে কামতর্পণের আকাঙ্ক্ষা থেকে দেখা দেয় ঈহা বা প্রচেষ্টা। তখন বলের প্রকাশ হয়। কাম্য বস্তুকে আমরা তখন বলের দ্বারা অধিগত করতে চাই।

কিন্তু বাইরের বস্তুকে এমন বলাৎকারের দ্বারা বশীভূত করবার চেষ্টায় একটা দীনতা আছে। যে যথার্থ বলবান্, সে কখনও বলাৎকার করে না। বিষয়ের প্রতি তার রাগ বা কামনা কোনটাই থাকে না। কিন্তু আনন্দের উৎসরূপে বিষয় তার কাছে আপনা হতে উপস্থিত হয়—শিবের কাছে উমার মত। এই শিববীর্যই যথার্থ বল।

প্রশ্ন

আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞানীকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং 'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্' (৭।১৬-১৮) বলা হইয়াছে কেন? জ্ঞানীর লক্ষণ বলা হইয়াছে নিত্যযুক্ত এবং একভক্তিবিশিষ্ট। ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই কি গীতার অভিপ্রেত?

উত্তর

ভগবানের গুণময়ী মায়া আমাদের ঘিরে রেখেছে, তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া বড় কঠিন। ছাড়ানো যায় জ্ঞানে এবং ভক্তিতে। ভক্তি অর্থ তাঁর কাছে প্রপন্ন হওয়া, তাঁকে সর্বস্ব বলে আঁকড়ে ধরা (৭।১৪)।

কিন্তু প্রপত্তি তো সবার আসে না, আসতে পারে একমাত্র তাঁর প্রসাদে।

সে-প্রসাদের ধারা নিত্যনির্ঝরিত, কিন্তু তাকে ধরবার জন্য আমাদেরও কিছু করণীয় আছে। সে-করণীয়ের সংজ্ঞা হল—'সুকৃতি'। তাঁকে ছেড়ে মোহের বশে মায়ার কবলিত হয়ে আমরা যা-কিছু করি, তা-ই দুষ্কৃতি। দুষ্কৃতরা অজ্ঞান, অভক্ত (৭।১৫)। তারা আসুরভাবাপন্ন, তাদের পরিচয় পরে দেওয়া হয়েছে (১৬।৪,৭-১৮)।

দুষ্কৃতির পাট চুকে গিয়ে সুকৃতির দিকে চিত্তের মোড় যখন ঘোরে, তখনই ভক্তির উদয় হয় (৭।১৬)। সাধারণত এই মোড় ঘোরে সংসার থেকে আঘাত পেয়ে। তাঁকে ছেড়ে যা-কিছু আঁকড়ে থাকি, তা-ই একদিন আঘাত দেয়—তাঁরই প্রসাদে। তখন তাঁর দিকে ফিরি আর্ত হয়ে। এইতে ভক্তির সূচনা। কিন্তু এ-ভক্তি সর্বনিম্নকোটির।

আর্তের চাইতে অর্থার্থী ভক্ত বিশিষ্ট। অর্থার্থীর প্রাণ কিছু চায়। যা নিয়ে আছে, তাতে সে তৃপ্ত নয়। তার মূঢ়তা কিছুটা ফিকা হয়ে এসেছে। কিন্তু যা সে চায়, তা পেয়েও যেন সে পায় না। বাইরের কোন কিছুই তাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। বাইরের খোঁজা তখন মোড় নেয় অন্তরের খোঁজায়।

কিন্তু সে-খোঁজার মূলেও প্রথমত থাকে আত্মতৃপ্তি, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-তর্পণ। তখনও ভক্ত বিষয় খোঁজে, ঠিক তাঁকে স্বরূপে খোঁজে না। তবে অন্তরের খোঁজায় চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। তখন আর বিষয়ে তৃপ্তি মেলে না। বিষয়কে ছাড়লে চিত্ত অন্তরাবৃত্ত হয়ে নজর দেয় বিষয়ীর দিকে। এই অন্তরাবৃত্তি ও বিষয়ীর অনুসন্ধান থেকেই জাগে জিজ্ঞাসা। জানতে চাই তাঁকে, জানতে চাই নিজেকে, জানতে চাই তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক। জিজ্ঞাসু ভক্তের এই লক্ষণ। এ-ভক্ত বিশিষ্টতর।

যখন জানি বলেই আরও ভালবাসি, তখন আমি জ্ঞানী ভক্ত। ভক্তি দিয়েই শুরু হয়েছিল তাঁকে চাওয়া। সেই ভক্তি নিয়ে গেল জ্ঞানে। জ্ঞান-ভক্তি মিলে গেল। একে 'জ্ঞানমিশ্রা' ভক্তি বলে 'জ্ঞানশূন্যা' ভক্তির চাইতে খাটো করবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। গীতায় যে-জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তা হল—'বাসুদেবই সব' এই জ্ঞান (৭।১৯)। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' জ্ঞানীর মহাবাক্য। 'বাসুদেবঃ সর্বম্' ভক্তের মহাবাক্য। দুয়ে কি কিছুমাত্র তফাত আছে? তাঁকে সর্বত্র দেখে যে-ভালবাসা, সেই ভালবাসাই তো পরমা। তখনই বুঝতে পারি, সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক সব ভাবই আসছে তাঁথেকে—দেখছি তারা সবাই তাঁর মধ্যে, কিন্তু তবুও তাদের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে যাননি (৭।১২)।

এই বোধ হল নিত্যযুক্ততা এবং একভক্তির লক্ষণ। 'সবই আমি' আর 'সবই তিনি'—একই কথা। কেবল একটিতে দৃষ্টি প্রত্যক্ (subjective) আরেকটিতে পরাক্ (objective)। একটি জ্ঞানীর দৃষ্টি, আরেকটি ভক্তের দৃষ্টি। কিন্তু জ্ঞানী যখন বলেন, 'ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বম্', তখন আত্মা বলতে তিনি তাঁকেই বোঝেন, নিজের অহংকে নয়। তখন তাঁর আত্মা ভগবানেরই আত্মা, অথবা ভগবানই তাঁর আত্মা। ভগবানও বলছেন, জ্ঞানী আমারই আত্মা। এই জ্ঞানী ভক্ত বিশিষ্টতম।

আসলে জ্ঞান আর ভক্তি হাতের এপিঠ ও ওপিঠের মত। দুটিকে তফাত করা যায় না।

প্রশ্ন

'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে' (৭।১৯)—গীতার এই বাণীর উদ্দেশ্য কি এই যে, এক জন্মের সাধনায় মানুষ ভগবানকে লাভ করিতে পারে না? সাধনার ক্রমপরিণতিতেই সিদ্ধিলাভ ঘটে?

উত্তর

এর আগেই ভগবান চার রকম ভক্তের কথা বলেছেন ; এ-ও বলেছেন, আর্ত এবং অর্থার্থী ভক্তের চাইতে জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী ভক্ত শ্রেষ্ঠ—যদিও সব ভক্তই উদার। কেননা, ভগবানের দিকে চিত্ত যায় চিত্ত উদার হলেই।

আর্ত হতে জ্ঞানী পর্যন্ত একটা ক্রম আছে। জ্ঞানবান বলতে এখানে জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী উভয়কেই লক্ষ্য করা হয়েছে। আর্তি থেকে অর্থিতা—চিত্তের বিকাশের এই একটা ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে অর্থিতা বা কামনা হতে মুক্তি পেয়ে শুধু তাঁর জন্যই তাঁকে পাওয়ার সাধনা করা। এটি সহজে হয় না। পরের শ্লোকগুলিতে তার বিস্তৃত বিবৃতি আছে। বলছেন, 'কামনা জ্ঞানকে লুপ্ত করে দেয়। তাই মানুষ আমাকে ছেড়ে অন্য দেবতার ভজনা করে কামনা পূরণের জন্য। ওটা তাদের স্বভাব। আমি তাতে বাধা দিই না ; বরং এই উপলক্ষ্যে দেবতাতে তার শ্রদ্ধাকে অচল করে দিই। ফলে তার কামনার তর্পণ হয়—যদিও সে বুঝতে পারে না এই তর্পণের বিধান আমিই করে দিয়েছি।'

এই বুঝতে না-পারাটাই অজ্ঞান। এ কাটতে অনেক জন্ম লাগে। তখন জ্ঞানোদয়ে জিজ্ঞাসার উদয় এবং তার ফলে জ্ঞান। তখন তাঁর প্রতি সত্যকার প্রপত্তি।

যেখানে প্রকৃতি, সেখানেই পরিণাম সেখানেই ক্রম। আর সাধনা তো সবসময় প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই। কাজেই তাতে ক্রম থাকবেই।

প্রশ্ন

'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ' (৭।২৪)—অব্যক্তকে ব্যক্তিমাপন্ন মনে করে বুদ্ধিহীন যাহারা তাহারাই। অব্যক্ত ভাবটিই কি পরম ভাব? বুদ্ধিমান যাঁহারা, তাঁহারা কি ভাবে উপাসনা করেন?

উত্তর

অব্যক্তই ভগবানের অব্যয় অনুত্তম পরম ভাব। এই অব্যক্ত ব্যক্ত হয়েছেন জগতে। তিনি স্বরূপে থেকেও মানুষী তনুকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হয়েছেন আমাদের মধ্যে (৯।১১)। তাঁর অব্যক্ত এবং ব্যক্তি দুটি ভাবই যুগপৎ ধারণা করতে পারাই হল 'বুদ্ধি'র কাজ। যারা অবুদ্ধি, তারা হয় অব্যক্তকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির উপাসনা করে, অথবা অব্যক্তে আসক্তচিত্ত হয়ে ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে (১২।৫)। দুটিই একদেশদর্শিতা।

তিনি যখন 'ব্যক্তিমাপন্নঃ' হন, তখন 'দেবতির্যঙ্‌নর'-রূপে আবির্ভূত হন। সব দেবতাই তাঁর ব্যক্তিভাব। নরে ও তির্যক্‌ প্রাণীতে তাঁর অবতরণ—এ-ও তাঁর ব্যক্তিভাব। কিন্তু এই ব্যক্তিভাবের পিছনে যে অনুত্তম অব্যক্ত ভাব রয়েছে, যার বিশদ বর্ণনা তিনি বহুজায়গায় দিয়েছেন, বিশেষ করে দ্বাদশাধ্যায়ের ভক্তিযোগের গোড়ায়, তার অনুভব না হলে ব্যক্তির উপাসনায় তাঁকে সমগ্রভাবে জানা যায় না।

'বুদ্ধি' সংজ্ঞাটি গীতায় পারিভাষিক। ওটি উপনিষদের 'প্রতিবোধ', বৌদ্ধশাস্ত্রের 'বোধি', পতঞ্জলির 'প্রাতিভজ্ঞানে'র সমতুল্য। বেদে একেই বলা হয়েছে 'বেদ' 'সংবিৎ' 'বিদথ' ইত্যাদি। এখানে বুদ্ধি সাংখ্যের বুদ্ধিতত্ত্বের চাইতেও উচ্চতর ভূমির অনুভব। এটি গুণময়ী বুদ্ধি নয়, গুণাতীত বুদ্ধি।

প্রশ্ন

অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ সহিত ভগবানকে জানার তাৎপর্য কি? মৃত্যুকালে এইরূপ সমাহিত ব্যক্তিরই ভগবৎ-স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না (৭।৩০)। অন্তিম সময়ে অধিকাংশেরই তো ভগবৎ-স্মৃতি সমুজ্জ্বল থাকে না, তাহার কারণ কি?

উত্তর

এই শ্লোকটি বুঝতে হবে আগের শ্লোকটির সঙ্গে মিলিয়ে। সাতটি তত্ত্বের জ্ঞানে জ্ঞান পূর্ণ হয়। তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পরের অধ্যায়ের গোড়াতে আছে।

জীবনে যা জানলাম, তার পরীক্ষা মরণে। বলতে গেলে সমস্তটা জীবনই বৈবস্বত মৃত্যুর প্রস্তুতি। জীবন যদি বৈবস্বত হয়, তবেই মৃত্যুও বৈবস্বত হবার সম্ভাবনা। বিবস্বান্ হলেন উত্তম জ্যোতিঃ, তাঁর আলোতে বাঁচতে হবে—তাঁর আলোতেই মরতে হবে। এটি বৈদিক আদর্শ।

জীবনের প্রথম পর্ব উদয়ন—সূর্যের উদয়নের মত। তখন জরাও নাই, মৃত্যুও নাই। কিন্তু দুপুরের সূর্য যেমন ঢলতে আরম্ভ করে, মধ্য জীবনে এসে আমরাও তেমনি পশ্চিমে হেলতে শুরু করি। এই হল জরা ও মরণের ছায়া জীবনের 'পরে। এথেকে মুক্তি চাই। সমস্ত জীবনটা এই মুক্তির প্রযত্ন। প্রযত্ন সিদ্ধ হয় যদি তাঁকে আশ্রয় করি এবং তাঁকে সর্বময়রূপে অনুভব করি।

প্রথম অনুভব তাঁর ব্রহ্ম-ভাবের। ব্রহ্মরূপে তিনি পরম, তিনি অক্ষর—তিনি সব ছাপিয়ে এবং সমস্ত বিকারের অতীত আকাশবৎ সত্তা। এই ব্রহ্মেই আত্মা একটি বিন্দুঘন সত্তা—আকাশে নক্ষত্রের মত, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের মত। তার একটা স্বকীয়তা আছে, সে একটা বিশিষ্ট ভাবের বাহন। কিন্তু তার এই স্বভাব ব্রহ্মেরই একটি নিত্য ভাব—সূর্যমণ্ডল হতে প্রসৃত সূর্যাংশুর মত। ভূতকে আশ্রয় করে এই ভাব ক্রিয়াশীল হচ্ছে যে-বিশ্বে, তা ব্রহ্মেরই আত্মবিসৃষ্টি। এই বিসৃষ্টি তাঁর কর্ম। এই হল জ্ঞানের একটি ত্রিপুটী—ব্রহ্ম আত্মা এবং জগৎকে নিয়ে। আরেকটি ত্রিপুটী হল অধিভূত অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ তত্ত্ব নিয়ে।

অক্ষর হতে বিসৃষ্টির ফলে ভূতের উৎপত্তি। ভূতেরা ক্ষরভাব। নিত্যই তাদের পরিণাম চলছে। ভূতসংঘাতের কেন্দ্রে আছেন

আত্মা—স্বভাব নিয়ে। ক্ষরভাব চরিষ্ণু, স্বভাব স্থাণু। স্থাণু হলেও তার একটা চিন্ময় পরিণাম আছে, যার প্রকাশ জীবভূতা পরা প্রকৃতিতে (৭।৫)। এই প্রকৃতির অভিযান দিব্যভাবের দিকে। ভূতকে আশ্রয় করে দেবতার বিকাশ ঘটছে—জড় হতে চৈতন্যের উন্মেষ হচ্ছে। উন্মেষ হচ্ছে ব্যক্তিতে এবং বিশ্বে। বেদে একে বলা হয়েছে যথাক্রমে অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত। সোজা কথায় ভূতগ্রামের ক্ষরভাবকে অবলম্বন করে আমার স্বভাব দিব্য হয়ে উঠছে, আমার মধ্যে পুরুষের অভিব্যক্তি হচ্ছে। এমনি করে আমার জীবনায়নে দেখা দিচ্ছে অধিভূত অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত ভাবনার একটি ত্রিপুটী।

আমি দেবতা হচ্ছি যজ্ঞের মাধ্যমে। আমার সমস্ত জীবনটাই একটা যজ্ঞ। এ-শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণ পেয়েছিলেন ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের কাছ থেকে—ছান্দোগ্যোপনিষদে তার বিবৃতি আছে। কিন্তু আমার যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর তিনি—আমি যজমান মাত্র। তিনিই আমার যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা। অতএব আমার অধিদৈবত সাধনায় তিনিই ভূতসংঘাতরূপী আমার এই দেহে যজ্ঞেশ্বর—এই তাঁর অধিযজ্ঞরূপ। সোমযাগের শেষ অনুষ্ঠান অবভৃথ—যজ্ঞের উপকরণাদি সবকিছু আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া। জীবন-যজ্ঞের অবভৃথ হল মৃত্যু। তখন তাঁতে যুক্তচেতা হয়ে তাঁর বৈবস্বত আলোর স্রোতে ভেসে চলা।

কিন্তু জীবনে যদি প্রতিমুহূর্তে তাঁকে যজ্ঞেশ্বর বলে না জানি, তাহলে মৃত্যুর সময় তাঁকে যে ভুলে যাব, সে তো আশ্চর্য নয়। আর ভুললেই সংসার—মোক্ষ নয়।

প্রশ্ন

গীতার অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে (৮।১) আছে—ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত এবং অধিদৈবই-বা কি? এই পরিভাষাগুলির তাৎপর্য কি? পুরুষোত্তমের নিকট অর্জুন এই প্রশ্নগুলি করিয়াছেন। ক্ষর এবং অক্ষর-ব্রহ্মের জ্ঞাতাই কি 'পুরুষোত্তম'?

উত্তর

পারিভাষিক শব্দগুলি সপ্তমাধ্যায়ের শেষে আছে এবং তা নিয়ে কিছু আলোচনা আগেই করা হয়েছে।

ব্রহ্ম সবার মূলে। আত্মচৈতন্যের বৃহত্তম স্ফুরণেই ব্রহ্মের বোধ। ব্রহ্ম আবার দ্বিবিধ—শব্দব্রহ্ম (৬।৪৪), আর পরব্রহ্ম (এখানে 'পরমং ব্রহ্ম')। অক্ষরের ক্ষরণে জগৎ (ঋ. ১।১৬৪।৪২)। এই ক্ষরণশক্তিকে বেদে বলা হয়েছে বাক্ (ঋ. ১।১৬৪।৪১)। বাক্ই শব্দব্রহ্ম। শব্দব্রহ্ম হতে বিসর্গ বা বিসৃষ্টি। তার পরিণাম 'ভূতগ্রাম' (৮।১৯)। ভূতগ্রাম 'ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে' (৮।১৯), তাই তাকে আশ্রয় করে পুরুষের ক্ষরভাব।

অক্ষরের ক্ষরণ হল আকাশের স্পন্দন। ওই স্পন্দনই বাক্ বা শব্দ। বৈখরী বাক্ নয়, গুহাহিতা পরা বাক্। বাকের মধ্যে ভাব আছে। ভাবটি হল ভূতের বীজ। প্রত্যেক ভূতের যে নিজস্ব ভাব, তা-ই হল তার 'অধ্যাত্ম' কি-না আত্মাকে অধিকার করে যা-কিছু সব। 'আত্মা' বলতে এখানে তনু এবং আত্মার অবিনাভাব বুঝতে হবে—প্রাচীন বৈদিক অর্থে। পরিভাষাগুলি বেদ থেকেই নেওরা। অতএব 'কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্' (৭।২৯) হল তনু থেকে আরম্ভ করে আত্মা পর্য্যন্ত সব-কিছু। এইটিই 'স্ব-ভাব'।

একদিকে ভূত—একেবারে অস্তিত্বের কুমেরু। ওটি হল উপাদান। তাকে আশ্রয় করে আছে অক্ষরের একটি ভাব। এই ভাবটি ক্ষর, কি-না তার পরিণাম হয়। ভূতের মধ্যে ভাবটি বীজরূপে নিহিত আছে। সেটির উদ্ভব হচ্ছে ব্রহ্মের প্রেরণায়। ভূত হতে ভাবের উদ্ভবাভিমুখী যে-প্রেরণা তা-ই হল কর্ম। কর্ম একটা বিসর্গ কি-না ব্রহ্মের উপচে পড়া—অক্ষরের ক্ষরণ।

ভূতবীজ যে-ভাব, তা দিব্য; ভূত মর্ত্য। দিব্যভাবের ঘনবিগ্রহ হল—দেবতা। দেবতা পুরুষবিধ। সমস্ত দেবতার মূলে যে-পরমদৈবত, তিনিই দিব্য পুরুষ (৮।৮-৯) বা পরঃ পুরুষঃ

(৮।২২)। তিনি সমস্ত দেবতাকে অধিকার করে আছেন। তিনিই **পুরুষোত্তম**—তবে কিনা এক বিশেষ অর্থে, সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহরূপে।

দেহীর জীবনযাত্রা একটা যজ্ঞ। এই যজ্ঞের **যজ্ঞেশ্বর** সেই পুরুষোত্তম। এ-ই তার **অধিযজ্ঞ** রূপ।

পুরুষোত্তম সংজ্ঞাটির ব্যবহার গীতায় এই প্রথম (৮।১)। এটি লৌকিক ব্যবহার। তার পরমার্থ ব্যক্ত হয়েছে পঞ্চদশ অধ্যায়ে (১৫।১৮)—ওইটি বৈদিক ব্যবহার। পুরুষোত্তম সব।

প্রশ্ন

'মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্' (৮।৫)—এই 'মামেব' কে? 'স মদ্ভাবং যাতি' (৮।৫)—এই মদ্ভাবটি কি? 'তদ্ভাবভাবিতঃ' (৮।৬)—এখানে ভাবের ভাবনা করিতে বলা হইয়াছে, কোন মূর্তি বা বিগ্রহের কথা তো বলা হয় নাই? 'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (৮।৭) কি তত্ত্বে, ভাবে, না বিগ্রহে?

উত্তর

'মামেব' বলতে যে-পুরুষকে লক্ষ্য করা হয়েছে, তাঁর পরিচয় এর পরেই দেওয়া হয়েছে নবম শ্লোকে। তিনি দিব্য পরমপুরুষ (৮।৮), বিশ্বের আদি বলে পুরাণপুরুষ, প্রতি জীবে অণু হতে অণীয়ান্ হয়ে হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামী এবং অনুশাসিতা অর্থাৎ চৈত্যগুরু, সবার ধাতা; **তাঁর রূপ অচিন্ত্য,** তবে কিনা অন্ধকারের ওপারে তিনি আদিত্যবর্ণ—এ-ভাবনা করা চলে। বেদে তাঁকে কবি বলে বর্ণনা করা হয়েছে—এ-জগৎ তাঁর অজর অমর কাব্য (শৌনকসংহিতা)। এই তাঁর তত্ত্ব। এই তত্ত্বই আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হচ্ছে ভাবরূপে। তত্ত্বত যিনি অক্ষর পরমব্রহ্ম, ভাবরূপে তিনিই আবার অধিভূত অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন (৮।৩-৪)। আবার পরমপুরুষের এই তত্ত্ব এবং ভাব বিগ্রহেও প্রকট হয়েছে, মানুষী তনুকে আশ্রয় করেছে—একথা ভগবান পরে বলবেন (৯।১১)।

বিগ্রহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ভাব বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয়, আর তত্ত্ব বুদ্ধিরও ওপারে। তত্ত্বটি হল তাঁর লোকোত্তর পরম ভাব। তাঁকে জানতে হবে 'সর্বভাবেন' (১৮৷৬২)—এই তিনভাবেই। তবেই তাঁকে পুরাপুরি পাওরা যাবে।

সব ভাব সবাই ধারণা করতে পারে না। মৃত্যুকালে সংস্কার এবং অভ্যাসবশত (৮৷৮) যে যে-ভাব আশ্রয় করে, সেই ভাবই সে পায় (৮৷৬)। কিন্তু অভ্যাসটি জীবনব্যাপী হওরা চাই—'সর্বকালেষু' হওরা চাই (৮৷৭)। আবার কর্ম হতে বিরত হয়ে অভ্যাস করাই যথেষ্ট নয়, জীবনের কুরুক্ষেত্রেও তাঁর ভাবে ভাবিত হয়ে তাঁর অনুস্মৃতিকে বহন করে চলা চাই (৮৷৭)। মন বুদ্ধি সব তাঁতে অর্পণ করতে হবে—যেমন নির্জনে তেমনি সজনে, যেমন অন্তরে তেমনি বাইরে।

বাইরে বিগ্রহ উপলক্ষ্য থাকেই—যেমন অর্জুনের সামনে শ্রীকৃষ্ণ। উপাসকের কাছে ভাবময় বিগ্রহ। শিষ্যের কাছে গুরু। কিন্তু স্থূল বা সূক্ষ্ম বিগ্রহেই আটকে থাকলে চলবে না—যেতে হবে শুদ্ধ ভাবে এবং পরম ভাবে বা তত্ত্বে। নইলে মূঢ়ের মত তাঁকে অবজ্ঞা করা হবে (৯৷১১)।

প্রশ্ন

অভ্যাস-যোগ কি ?—রাজযোগ না হঠযোগ ? পরম পুরুষ আর পুরুষোত্তম কি একই কথা (৮৷৮) ?

উত্তর

প্রশ্ন হচ্ছে, মৃত্যুকালে কি করে তাঁকে পাওরা যাবে। আগেই বলেছি, জীবনে যদি তাঁকে না পাই, তাহলে মরণে পাওরা কঠিন। জীবনে একরকম পাওরা আছে—সহজভাবে তাঁকে পাওরা, যার কথা বেদে-উপনিষদে অনেক আছে। এটাকে বেদে বলা হয়েছে ধীযোগ। এটা গীতার বুদ্ধিযোগের সগোত্র—কিন্তু তবুও দুয়ে সূক্ষ্ম ভেদ আছে।

এছাড়া যোগের আর দুটি ধারা আছে, একটি মনের প্রত্যাহার, আরেকটি প্রাণের সংযমন। আগেরটি রাজযোগ, পরেরটি হঠযোগ। দুটিরই লক্ষ্য নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। মৃত্যুর সময় চেতনা গুটিয়ে আসে—একথা উপনিষদেও আছে, যদিও বৈবস্বত মৃত্যুতে তা ছড়িয়েও পড়তে পারে।

অভ্যাস দুটি যোগেরই প্রাণ। মন চঞ্চল, তাকে কি করে স্থির করা যায়, অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অভ্যাস আর বৈরাগ্যের দ্বারা, (৬।৩৫)। পতঞ্জলিরও ওই কথা (অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ—সমাধিপাদ, ১২ সূত্র)। প্রাণের নিরোধে মনের নিরোধ হতে পারে, এটা হঠযোগীর নির্দেশিত পথ। প্রাণকে নিরোধ করতে হলে তাকে ধারণার দ্বারা দেহের কোথাও-না-কোথাও গুটিয়ে আনতে হবে (তু. ৮।১২)। সুতরাং তার জন্যও অভ্যাস দরকার।

মৃত্যুবিজ্ঞানটিতে ভগবান প্রাণ ও মন দুটিকেই গুটিয়ে আনবার উপদেশ দিচ্ছেন। অতএব এক্ষেত্রে অভ্যাসযোগ প্রবর্তিত হচ্ছে প্রাণ এবং মন উভয় ক্ষেত্রেই। সুতরাং সাধনাটি হঠযোগ আর রাজযোগ দুয়ের সমন্বয়ে। আরেকরকম প্রয়াণ হতে পারে মহাবিদেহ-ধারণার দ্বারা। সে-ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। কিন্তু তার কথা এখানে বলা হয়নি।

'পরমঃ পুরুষঃ' (৮।৮), 'পরঃ পুরুষঃ' (=পরমাত্মা ১৩।২৩), 'উত্তমঃ পুরুষঃ' (১৫।১৭) আর 'পুরুষোত্তমঃ' সবই এক কথা। এই পরম পুরুষকে আমরা উপনিষদেও দেখতে পাই। বেদে পুরুষ শব্দটি বিগ্রহবত্তার ব্যঞ্জনা বহন করে সর্বত্র। কোথাও তিনি বিশ্ব-বিগ্রহ—যেমন পুরুষসূক্তে; কোথাও হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ হিরণ্ময় পুরুষ—যেমন ছান্দোগ্যে; কোথাও তাঁর কল্যাণতম রূপ—যেমন ঈশোপনিষদে ইত্যাদি। আবার তিনি অমূর্ত বা অবিগ্রহ এমন কথাও আছে। পুরুষের অমূর্ত দিকটার উপর জোর দিয়েছেন

মুনিরা। মুনিদের দর্শনে ঈশ্বর 'পুরুষবিশেষ'—সেখানে বিগ্রহের কথা উঠছেই না। ভাগবতরা তেমনি জোর দিয়েছেন বিগ্রহবত্তার উপর।

কিন্তু তিনি সবিগ্রহ অবিগ্রহ—আরও কত কি, তার কোনও ইতি করা যায় না।

প্রশ্ন

ভক্তির সঙ্গে যোগবলও থাকা চাই। দিব্য পুরুষকে পাইতে হইলে ভক্তি-সংযুক্ত যোগবলেরও প্রয়োজন আছে—ভগবানের উপদেশে এইরূপই তো বোঝা যায় (৮।১০)। ভ্রূমধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থির করিতে হইলে যোগের প্রাণায়াম তো অত্যাবশ্যক। যোগবলসংযুক্ত ভক্তি, কেবল ভক্তি নহে—ভগবানের এই বাণীর বিশেষ রহস্যার্থ আছে মনে হয়। এসম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত বা অভিমত কি?

উত্তর

যোগ একটি সার্বভৌম সাধন-পন্থা। কর্ম জ্ঞান বা ভক্তি যে-পথেই চল না কেন, তোমাকে যোগের আশ্রয় নিতেই হবে।

সমস্ত যোগের সাধারণ লক্ষ্য হল চেতনাকে একাগ্রভূমিতে উত্তীর্ণ করা। একাগ্রভূমি হল বিজ্ঞানভূমি। বিজ্ঞান শরীর প্রাণ ও মনের উর্ধ্বে। এই মানসোত্তর ভূমিতে স্থিতি না হলে কর্ম জ্ঞান বা ভক্তি কোনটাই সিদ্ধ হয় না। সুতরাং কেউ যদি বলেন, আমি যোগের পথে না গিয়ে ভক্তি লাভ করব, তাহলে কথাটা আমার কাছে গোলমেলে ঠেকে। এসব ক্ষেত্রে ভক্তিবাদীরা সাধারণত যোগ বলতে রাজযোগ বা হঠযোগই বোঝেন বোধ হয়। কিন্তু গীতার আঠারো অধ্যায়ে যে দেখছি আঠারো রকম যোগ।

আসন প্রাণায়াম মুদ্রা ইত্যাদি দিয়ে হঠযোগী একাগ্রভূমিতে উঠতে চান, রাজযোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধের দ্বারাও তা-ই চান। তার জন্য তাঁরা কতকগুলি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু চিত্তের একাগ্রতা বা তন্ময়তা তো ভক্তেরও কাম্য। উমার ভাষায় 'ভাবৈক-

ব্রসং মনঃ' না হলে কি শিবকে পাওরা যায়? অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গগুলি ভক্তি-সাধকের বা জ্ঞান-সাধকের অন্য উপায়ে এসে যায়। এমন-কি যে-কুণ্ডলিনীযোগ হঠযোগের বৈশিষ্ট্য, তা-ও ভাবের সাধনায় বা জ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

লক্ষ্য করো, ওই শ্লোকটিতে যে ভক্তিযোগ আর যোগবলের সমবায়ের কথা বলা হয়েছে. তা রাজযোগের অন্তরঙ্গ-সাধনগুলিকে আশ্রয় করে। সেগুলি হল ধারণা ধ্যান আর সমাধি। এগুলি ভক্তিযোগ বা জ্ঞানযোগেও আছে। গীতায় ষট্‌চক্রের কথা বলা হয়নি— হৃদয় ভ্রূ আর মূর্ধা—এই তিনটি দেশেই প্রাণ আর মনের 'আবেশ' 'নিরোধ' এবং 'আধানে'র কথা বলা হয়েছে। এটি ঔপনিষদ-যোগের ধারা। ঐতরেয়োপনিষদে ওই তিনটি দেশ বা 'আত্মার আবসথে'র কথা আছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ওই প্রাচীন যোগের কথাই বলছেন।

মানুষ সারাজীবন সাধনা করলেও তার চরম পরীক্ষা হয় মৃত্যুকালে। তখন সুপ্ত সংস্কার জেগে উঠে সব বানচাল করে দিতে পারে। তাই আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'জপ কর, তপ কর, মরতে জানলে হয়'। মরণের সময় যে-আঁধার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে, তাকে যোগবল ছাড়া হটানো যায় না। সে-যোগ নিরোধাত্মক হতে পারে, আপ্যায়নাত্মকও হতে পারে। গীতায় দুরকম যোগেরই উপদেশ আছে। আর দুটি যে একেবারে আলাদা-আলাদা, তা-ও নয়। উপনিষদের যোগে আপ্যায়নের উপর জোর দেওরা হয়েছে, নিরোধ সেখানে গুণীভূত (secondary)। ভক্তিতেও সাধারণত এই আপ্যায়নের উপর জোর দেওরা হয়। কিন্তু তাতেও নিরোধের ক্রিয়া কিছু-না-কিছু এসেই যায়। দুয়ের মধ্যে একটা কৃত্রিম বিরোধ সৃষ্টি করা সমীচীন নয়—বিশেষত গীতার অনুশাসন বোঝবার বেলায়।

প্রাণবায়ু যেমন রাজযোগের প্রাণায়ামে স্থির হয়, তেমনি ভাবযোগের প্রাণায়ামেও স্থির হয়ে যেতে পারে। ভাব মনের ওপারে, ওটি বিজ্ঞানভূমির সম্পদ। ওকে পাওয়া যায় বোধি বা প্রতিবোধের দ্বারা। হৃদয় থেকে ভ্রূমধ্য, ভ্রূমধ্য থেকে মহাশূন্য—চেতনার উৎক্রান্তির এটি একটি স্বাভাবিক পথ। প্রতিবোধের ফলে জ্ঞানী বা ভক্তের ওটি সহজে খুলে যেতে পারে। তখন প্রয়াণকালে 'হৃদিসন্নিবিষ্ট' পুরুষোত্তম আমাকে নিয়ে অবলীলাক্রমে উজিয়ে যান।

প্রতিবোধ সহজে জাগ্রত না হলে রাজযোগ বা হঠযোগের উপায় অবলম্বন করা দরকার হয়। সেটা নির্ভর করে সাধকের সংস্কার ও সামর্থ্যের উপর।

মোটকথা, ভক্তিযোগে রাজযোগ অপরিহার্য এ-ও যেমন জোর করে বলা যায় না, তেমনি ভক্তিতে যোগের স্থান নাই—এ-ও বলা চলে না। যোগেরও অনেক রকমারি আছে। আর গীতাতে 'যোগ' সংজ্ঞাটি মোটেই কোনও লোকাতত অর্থে ব্যবহার করা হয়নি।

প্রশ্ন

গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১২-১৩ শ্লোকদ্বয়ের রহস্যার্থ বর্ণনা করিলে ভাল হয়। পরমা গতি লাভের একটা সুস্পষ্ট সাধন-প্রণালী ভগবান এখানে ব্যক্ত করিয়াছেন, নয় কি? পরমা গতি লাভের জন্য আমাদের কি কি করিতে হইবে?

উত্তর

এই সাধনপ্রণালীর কথা আগেই কিছুটা বলেছি। ১২ আর ১৩ শ্লোকের সঙ্গে ১০ শ্লোকের সাধনটিও মিলিয়ে নিতে হবে। এই অনুষঙ্গে ১১ শ্লোক আর ১৪ শ্লোকও আলোচ্য।

আগেই বলেছি, সাধনটি একটি প্রাচীন যোগ—উপনিষদের নানা জায়গায় তার উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই একে বলেছেন 'যোগধারণা' (৮।১২)। ধারণা পতঞ্জলির অন্তরঙ্গ-যোগের প্রথম অঙ্গ

—হৃদয়াদি অধ্যাত্মপ্রদেশে (বহির্ধারণায় দেহের বাইরে মহাশূন্যে) প্রাণ-চৈতন্যকে ধরে রাখা। আরম্ভ করতে হবে হৃদয় থেকে, ক্রমে উজিয়ে যেতে হবে ভ্রূমধ্যে (৮।১০) এবং মূর্ধায়। মূর্ধার উজানে 'পদ' (৮।১১) বা পরমপদ বা পরমপুরুষ (৮।১০) বা অক্ষর (৮।১১)। পদ এবং অক্ষর সংজ্ঞা দুটি শ্লিষ্ট—বোঝায় পরব্রহ্ম এবং শব্দব্রহ্ম উভয়কে। শব্দব্রহ্ম 'ওম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম' (৮।১৩)—পরব্রহ্মের বাচক। এই ওঙ্কার মহাশূন্যের প্রাণস্পন্দ—সর্বদেহে অনুভূত হয় একটা ঝঙ্কার-রূপে। এর 'ব্যাহরণ' বা 'ব্যাহৃতি' (৮।১৩) হল 'নিঃশ্বসিত'কে অবলম্বন করে উদানবায়ুর সহায়ে হৃদয়স্থ ঊর্ধ্বনাড়ীর ভিতর দিয়ে প্রাণচৈতন্যের ধারাকে উত্তরবাহিনী করা।

আগেই বলেছি, জীবনে এটি অভ্যাস না করলে মরণের সময় ওঙ্কাররূপী মহাব্যাহৃতির 'উচ্চারণ' বা ঊর্ধ্বচালনা সম্ভব নয়। জীবনে প্রতিদিন এটি অবশ্যকরণীয় নিদ্রার সময়—যখন স্বভাবের নিয়মে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার আপনা হতে সংযত হয়ে আসে। মনকে তখন হৃদয়ে গুটিয়ে এনে প্রাণচৈতন্যের ধারাকে উজিয়ে দিতে হবে মাথার দিকে। ভ্রূমধ্য ভেদ করলেই চৈতন্য মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে, আর সুষুপ্তিকালীন সেই দেহবোধ হয় আকাশবৎ। এইটি হল যোগনিদ্রা।

আবার এটিও সম্ভব হয় অনুস্মৃতির দ্বারা। অনুস্মৃতির লক্ষণ হল আদিত্যবর্ণ পুরুষকে অণু-হতে-অণুতররূপে দেহের ভিতরে আর মহান্-হতে-মহত্তররূপে বিশ্বের সর্বত্র অনন্যচেতা হয়ে নিত্য স্মরণ করা (৮।১৩-১৪)। এই স্মরণের সঙ্গে-সঙ্গে শ্বাসে-প্রশ্বাসে ওঙ্কারের ব্যাহরণ চলবে হৃদয় আর মূর্ধার মধ্যে উজান-ভাটার ছন্দে। এটি হল 'ক্রিয়াযোগ' কি-না চলতে-ফিরতে যোগ।

যোগনিদ্রার সময় মুখ্যত ধারাটিকে উত্তরবাহিনীরূপে ভাবনা করতে হবে। ভাবনার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিপথের অনুভব হ্রস্ব হয়ে আসবে। অবশেষে প্রাণাপান সমান হয়ে শুধু নাসাভ্যন্তর-চারী বলে বোধ হবে (৫।২৭)। তখন মূর্ধায় মহাপ্রাণের নিত্য

আধানের অনুভব আসবে (৮।১২)। সে-প্রাণ আপূর্যমাণ অচল-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রবৎ—অল্পপ্রাণ তার উপরে-উপরে বীচিভঙ্গের মত।

মৃত্যুকালে এমনি করে যোগনিদ্রাকে মহানিদ্রায় পরিণত করাই 'পরমা গতি' (৮।১৩)।

প্রশ্ন

স্মরণের মাধ্যমে নিত্যযুক্ত যোগীরই সুলভ তিনি—এই কথাই ভগবান বলিয়াছেন (৮।১৪)। পরমা সিদ্ধি বলিতে কি জন্ম-মৃত্যু আবর্তনের উর্ধ্বে উঠাকে বোঝায়? 'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' (৮।১৬)—এই শ্লোকটির রহস্য কি? পরমা সিদ্ধিতে কি জন্মনিরোধ হইয়া যায়? পরমা সিদ্ধি কি জন্মগ্রহণ করিলে লাভ করা যায় না? 'জীবন্মুক্তি' কথাটির কি তবে কোনও তাৎপর্য নাই?

উত্তর

এই শ্লোকটিকে আগের দুটি শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে হবে। প্রয়াণকালে তাঁকে কি করে পাওয়া যায়, ভগবান্ তার উপায় বর্ণনা করে বলছেন, এই মৃত্যুযোগ জীবনে অভ্যাস না করতে পারলে মৃত্যুকালে তিনি সুলভ হন না। তার জন্য সতত অনন্যচেতা হয়ে নিত্যশ তাঁর স্মরণ করতে হবে, তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকতে হবে (তু. ৮।৭)। এসমস্ত কথা আগেই আলোচিত হয়েছে।

পরবর্তী শ্লোকের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ অনুধাবন করতে হবে। যোগী মৃত্যুর ভিতর দিয়ে উত্তীর্ণ হন মহাজীবনে—এটি সুপ্রাচীন বৈদিক সিদ্ধান্ত (ঋক্সংহিতার দশম মণ্ডলের যমসূক্তগুলি দ্রষ্টব্য)। উপনিষদের ভাষায় একে বলা হয় বৈবস্বত মৃত্যু। বৈবস্বত মৃত্যুতে মৃত্যু একবারই হয়, আর মৃত্যু হয় না। তাই একে ব্রাহ্মণে ও প্রাচীন উপনিষদে 'পুনর্মৃত্যুজয়'ও বলা হয়েছে। মরমীয়ারা একে বলেন মৃত্যুতে 'জ্যোৎমে জ্যোৎ মিলা জানা'—জ্যোতিতে জ্যোতির মিলিয়ে যাওয়া, আত্মজ্যোতির ব্রহ্মজ্যোতিতে লয় হওয়া।

এখানে একেই বলা হয়েছে 'দিব্য পরমপুরুষকে পাওয়া' (৮।১০), তাঁকে সহজে পেয়ে (৮।১৪) পরম গতি লাভ করা (৮।১৩)।

এ যেন বুদ্‌বুদের সমুদ্রে মিলিয়ে যাওয়া। বুদ্‌বুদ 'অণু', সমুদ্র 'মহান্'। ওই মহান সমুদ্র অণুপ্রমাণ বুদ্‌বুদে সন্নিবিষ্ট বা সম্যক্ নিবিষ্ট। নিবেশনের ফলে অণুর যে বৃহৎ হওয়া, তা-ই তার ব্রহ্ম-সমাপত্তি। উপনিষদের ভাষায়, এমনি করে বুদ্‌বুদের জ্ঞান-আত্মা বিস্ফারিত হয় মহান্ আত্মাতে (কঠ ১।৩।১৩)। মহান্ আত্মা বা মহাত্মা আদিত্যকল্প (দ্র. তৈত্তরীয় উ. ১।৫।২)। আদিত্যের উজানে আকাশ—তা-ই উপনিষদের শান্ত-আত্মা (কঠ. ঐ)। জ্ঞান-আত্মা নিত্য জীব; মহান্ আত্মা এবং শান্ত আত্মা ব্রহ্ম বা পরমপুরুষেরই বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তীর্ণ দুটি বিভাব। মৃত্যুকালে হৃদয়ের প্রদ্যোত অবলম্বনে নিত্য জীব এই দুটি বিভাবে সমাপন্ন হতে পারে—একথা উপনিষদে আছে (দ্র. বৃহ. ৪।৪।২...)। গীতাতেও এই কথাই বলা হচ্ছে।

অন্যত্র এই গতিকে সূর্যমণ্ডল ভেদ করে তারও উজানে যাওয়া বলা হয়েছে (তু. মুণ্ডক ১।২।৬,১১)। সূর্যমণ্ডলের নীচে যে-সমস্ত লোক, তাদের পরাকাষ্ঠা হল ব্রহ্মলোক। এই পর্যন্ত সংসারের সীমা—যার মধ্যে ব্যক্তিসত্তার পুনরাবর্তন ঘটে (৮।১৬)। বৈবস্বত-মৃত্যুযোগী এই লোকের ওপারে চলে যান। আর তাঁর এই লোকে দুঃখভোগ করবার জন্য বারবার জন্মাতে হয় না। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সব লোকই অশাশ্বত—সৃষ্টিতে ফুটে ওঠে, প্রলয়ে মিলিয়ে যায়। মহাত্মা এই সৃষ্টি-প্রলয়ের ঊর্ধ্বে। তিনি আদিত্য, তিনি আকাশ। আদিত্য হিরণ্ময় পরমপুরুষের 'শুক্লং ভাঃ', আর আকাশ তাঁর 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্' (ছান্দো. ১।৬।৬)। মৃত্যুযোগী এই পরমপুরুষের কৃষ্ণ-ভাতিতে সমাপন্ন হন। এই শুক্ল-ভাতি এবং পরঃকৃষ্ণ-নীলিমা দুই-ই শাশ্বত।

এই তাঁর পরম ধাম—যেন এক অব্যক্ত জ্যোতিঃসমুদ্র (তু. ৮।২০-২১)। এই সমুদ্রের বুকে বুদ্‌বুদ উঠছে, ভাঙছে, আবার উঠছে।

এটা হল বুদ্‌বুদের পুনর্জন্ম।' বুদ্‌বুদ অশাশ্বত, তার ফোটা আর ভাঙা দুই-ই দুঃখালয় কি-না দুঃখের হেতু। বৈবস্বত-মৃত্যুযোগী নিজের মধ্যেই এই বুদ্‌বুদের ভাঙা-গড়া অনুভব করেন, কিন্তু অধিষ্ঠান-তত্ত্বের সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকায় এই ভাঙা-গড়ায় তাঁর দুঃখ নাই—যেমন পরমপুরুষেরও নাই।

এমনি করে সৃষ্টির ভাঙা-গড়াকে বুকে নিয়ে সৃষ্টির অতীত হওয়াই হল যোগীর পক্ষে সেই 'সিদ্ধি' যা সম্যক্ এবং পরম অতএব 'পরমা সংসিদ্ধি'। এ শুধু পরিনির্বাণ নয়, আরও-কিছু। উপনিষদের ভাষায় এ হল সবিজ্ঞান মৃত্যু (দ্র. বৃহ. ৪।৪।২)।

এই সবিজ্ঞান মৃত্যু যাঁদের হয়, তাঁরা আবার এখানে ফিরে আসতেও পারেন। যেমন সবিজ্ঞান মৃত্যু, তেমনি তাঁদের সবিজ্ঞান জন্ম—শ্রীকৃষ্ণের মত জন্ম ও মৃত্যু দুয়েরই তাঁরা সাক্ষী (দ্র. ৪।৫)। তাঁদের সে-জন্মকে আর 'দুঃখালয় অশাশ্বত' পুনর্জন্ম বলা চলে না। তাঁরাই আধিকারিক পুরুষ। বৈবস্বত মৃত্যুতে জীবাত্মার অধিকার নিবৃত্ত হলেও মহাত্মার অধিকার তাঁদের বেলায় অক্ষুণ্ণই থাকে।

প্রশ্ন

'অহোরাত্রবিদ্' কথাটির রহস্যার্থ কি? অব্যক্তেরও পরপারের সনাতন ভাবটিই বা কি? জীবের শেষ গতি অক্ষর-ব্রহ্ম হইতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরের (৮।১৭-২১)?

উত্তর

অহোরাত্রের রহস্য জানা বৈদিক ঋষিদের মুখ্য সাধনা ছিল বলতে পার। বেদে আছে, মৈত্রম্ অহঃ, বারুণী রাত্রিঃ'—দিনের আলো মিত্রের অধিকারে, আর রাতের আঁধার বরুণের অধিকারে। মিত্রাবরুণ বেদের প্রসিদ্ধ যুগ্ম-দেবতা।

আর্যরা আদিত্যের উপাসক। আদিত্য পরমজ্যোতির প্রতীক। যে-আদিত্যদ্যুতি আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার কিন্তু

উদয়াস্ত আছে। ভোর হতে মধ্যদিন পর্যন্ত আদিত্যের উদয়ন এবং আলোর উপচয়। তার পরেই আদিত্যের অস্তময়ন এবং আলোর অবক্ষয়। অবশেষে যতক্ষণ পর্যন্ত দিন, ততক্ষণ পর্যন্ত রাত্রি। দিনের মধ্যে যেমন মধ্যদিনের পর থেকে আলো কমে আসে, তেমনি বলা যেতে পারে মধ্যরাত্রের পর থেকে আলো ফুটতে থাকে—তার দেবতা হলেন যথাক্রমে তমোভাগ এবং জ্যোতির্ভাগ অশ্বিদ্বয় (নিরুক্ত)।

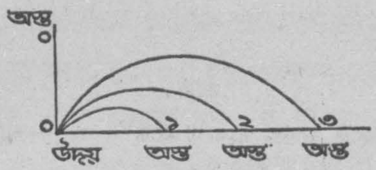
এমনি করে একটি অহোরাত্রের মধ্যে আলো আর অন্ধকার ভাগাভাগি হয়ে আছে। আলোর উপচয়ে জীবনের উল্লাস ; তেমনি আঁধারের সংক্রমণে মৃত্যুর ছায়াপাত। অহঃ যেমন রাত্রির দ্বারা গ্রস্ত হয়, তেমনি আমাদের জীবনও হয় মৃত্যুর কবলিত। আবার রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে যেমন আলো জাগে, তেমনি মৃত্যুমুখ হতে প্রমুক্ত হয়ে জাগে জীবন—একথাগুলি বেদে বহুজায়গায় আছে।

আলো আর অন্ধকারের, অহঃ আর রাত্রির, জীবনের আর মৃত্যুর এই মাখামাখিটা আমরা চাই না। আমরা চাই কেবলই আলো, কেবলই দিন, কেবলই জীবন। আমরা চাই অমৃত জ্যোতি (ঋক্-সংহিতা), চাই সকৃদ্দিবা অর্থাৎ যেখানে দিনই আছে রাত্রি নাই (উপনিষদ্)।

সে কোথায় আছে ? সংহিতা ব্রাহ্মণ উপনিষদ সবাই বলছেন, সে আছে। প্রতিদিন এই যে আদিত্যের আবর্তন দেখতে পাচ্ছি, তা বৃহৎ হতে-হতে এমন হতে পারে, যেখানে তার গতিপথে আর কোনও বাঁক থাকে না, আদিত্য যেন দিক্‌চক্রবাল হতে সোজা উর্ধ্বমুখে উঠে যান। এই গতিকে বলে 'অধ্বর' গতি, যার শেষটায় বিষ্ণুর পরম পদ। আদিত্যের দৃশ্যমান আবর্তগতির উর্ধ্বে তাঁর ওই অধ্বরগতির ফলে পরমধামে স্থিতি। সেইখানে গো-লোক—ভূরিশৃঙ্গ গো-যূথের ধাম (ঋক্-সংহিতা), সেইখানে যে যায় সে দেখে তার পায়ের নীচে অহোরাত্রের আবর্তন (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ)। আদিত্য

সেখানে 'একল', তাঁর উদয়াস্ত নাই (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। গীতায় একেই বলা হয়েছে, 'যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' (৮।২১)।

একটি রেখাচিত্র দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যেতে পারে।



অর্ধবৃত্তগুলি সূর্যের গতিপথ। o উদয়বিন্দু, ১, ২, ৩…অস্তবিন্দু। অর্ধবৃত্তের ব্যাস যতই বড় হবে, বৃত্তটি ততই খাড়া হবে এবং অবশেষে অনন্তে পৌঁছলে পর উদয়াস্ত হবে o—o এই সরলরেখাটি। অর্ধবৃত্তগুলিতে আদিত্যের বা জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিক্রমা, আদিত্যগতি তখন 'আবৃত্ত'। আমাদের সঙ্কীর্ণ জীবনের গতিও তাই। তাতে আলো-আঁধার দুই-ই আছে। চরমে যখন অর্ধবৃত্তটি সরলরেখায় পরিণত হবে, তখন ব্যাসের পরিমাপ হবে অনন্ত। তখন আর আবৃত্তগতি নাই—গতি 'অধ্বর' (বেদ) বা অনাবৃত্ত (উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র)।

যতক্ষণ পর্যন্ত আদিত্যগতির বক্রতা আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মার অধিকার। এই কালের পরিমাণ পুরাণাদিতে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে, আমাদের অহোরাত্রের মাপে। সংখ্যাটা ধারণার অতীত। তবুও এর মধ্যে আবর্তন আছে, সুতরাং সৃষ্টি-প্রলয় দিন-রাত আছে।

এই আবর্তনের মধ্যে বিশ্বের অভিব্যক্তি, তাকে ছাপিয়ে 'অব্যক্ত'। যেমন প্রকৃতির 'অব্যক্ত', তেমনি পুরুষেরও 'অব্যক্ত' (৮।২০)। দুটি অব্যক্ত যুগনদ্ধ। সেখানে 'মহতো মহীয়ঃ' হয়ে বিশ্বের অনন্ত প্রসার, আর 'অণোরণীয়ঃ' হয়ে অনন্ত সংহরণ—দুই-ই

এক। উদয়বিন্দু আর অস্তবিন্দুও এক—দুই-ই শূন্য। বেদে একে বলা হয়েছে বরুণের 'শূন' বা শূন্যতা, তাঁর 'অপীচ্য সমুদ্র' বা রহস্যময় সমুদ্র ইত্যাদি। গীতায় এই হল 'অক্ষর' (৮।২১) বা জীবের পরমগতি। কিন্তু পরমেশ্বর স্বয়ংই সেই 'অব্যক্ত পর অক্ষর' (৮।২০-২১), সুতরাং তাঁর গতিতেই স্থিতি, স্থিতিতেই গতি।

প্রশ্ন

'শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে' (৮।২৬)—আবৃত্তি-অনাবৃত্তি এই দুইটি পথের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা হয়। আবৃত্তি-অনাবৃত্তির ঊর্ধ্বে আরেকটি তৃতীয় ভূমি কি নাই? 'পরম স্থান' বলিতে তো সেই ভূমিকেই বোঝায় (৮।২৮)?

উত্তর

দুটি 'সৃতি' (৮।২৭) বা গতিপথের কথা ঋক্-সংহিতাতেই আছে (১০।৮৮।১৫)। সেখানে তাদের বলা হয়েছে 'স্রুতি'। বলা হয়েছে, একটি মর্ত্য পিতৃগণের, আরেকটি দিব্য পিতৃগণের। লক্ষণীয়, গীতায় দুটি গতিকেই বলা হয়েছে যোগীদের গতি। এদের একটিকে পিতৃযাণ আরেকটিকে দেবযান বলা হয়েছে বৃহদারণ্যকে (৬।২।২)। গীতার ভাবনা সংহিতার ভাবনার বেশী কাছাকাছি।

সমস্ত ভাবনাটি এসেছে আদিত্যোপাসনা থেকে। আদিত্যোপাসনারও-মূল হল আর্যদের জ্যোতিরুপাসনা। প্রত্যক্ষ দিব্যজ্যোতি হল আদিত্যজ্যোতি। ঋষির অধিদৈবত দৃষ্টিতে আদিত্য জড় আলোকপুঞ্জ নয়, 'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ'—সূর্য স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা (ঋ. ১।১১৫।১)। এই পরম আত্মার ভাবনা করতে হবে আপন 'আত্মায়' কি না 'তনু' (body) এবং 'আত্মায়' (spirit)। করতে-করতে 'সূর্যত্বচ্' হয়ে যাওয়া হল বৈদিক যোগের লক্ষ্য।

দ্যুলোকে আদিত্য, অন্তরিক্ষে চন্দ্র, আর পৃথিবীতে অগ্নি—মোটের উপর এই তিনটি জ্যোতিকে বেদে সাধনার অবলম্বন রূপে

গ্রহণ করা হয়েছে। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, তিনি আমাদের আত্মজ্যোতি। অগ্নিতে হোমদ্রব্য আহুতি দেওয়া হল যাগ—গীতার ভাষায় দ্রব্যযজ্ঞ (৪।২৮)। দ্রব্যের সহায়তা ছাড়া ভাবনা সহকারে এইটি অন্তরে অনুষ্ঠিত হলেই হয় জ্ঞানযজ্ঞ বা যোগযজ্ঞ, যা দ্রব্যযজ্ঞ হতে শ্রেষ্ঠ (৪।২৮, ৩৩)। এখানে গীতার উল্লিখিত সাধন-পন্থায় যাগ ও যোগ দুয়েরই সূচনা আছে।

যজ্ঞাগ্নিতে যা আহুতি দেওয়া হয়, তা যজমানের নিষ্ক্রয় (ransom) অর্থাৎ ওটি বস্তুত তার আত্মাহুতি। আহুতির দ্রব্য অগ্নিসাৎ হয়ে যায়, আর আগুনের শিখা ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আদিত্যে পৌঁছয়—আহুতির মূলে আছে এই ভাবনা। এমনি করে আমার আত্মজ্যোতি পরমাত্মজ্যোতিতে সমাপন্ন হয়, আমি অনুভব করি আদিত্যে যে-পুরুষ, আর আমাতে যে-পুরুষ দুই-ই এক (ঈশ ১৬, তৈত্তিরীয় ২।৮)। এই হল যোগীর অধ্যাত্ম-সিদ্ধি।

কিন্তু এমন হতে পারে, আহুতির সবটুকু আগুন হল না, তাতে ধোঁয়ার ভাগই বেশী হল। ধোঁয়া আদিত্যে পৌঁছয় না, কিছু দূর উঠে নীচে নেমে আসে। এটা আমরা চাই না, তবুও এমনটা হয়।

বস্তুত জীবনে ও জগতে আগুন আর ধোঁয়া, আলো আর আঁধার মেশামেশি হয়ে আছে। অহোরাত্রের অর্ধেক আলো অর্ধেক আঁধার, মাসের এক পক্ষ শুক্ল এক পক্ষ কৃষ্ণ, অয়নের একটিতে দিনের আলো বেড়ে চলে আরকটিতে কমে আসে। আমরা চাই জীবনে কেবল আগুন জ্বলুক ধোঁয়া যেন না থাকে, জগতে আলোই থাকুক অন্ধকার যেন না থাকে। এই চাওয়া সার্থক হতে পারে ভাবনায়, বাস্তবে নয়। তবে বাস্তবে দেখতে পাই—বিশেষত আলোর উপচয় আর অবক্ষয়ের বেলায়—দুয়ের মধ্যে একটা পর্যায় আছে। মধ্যরাত্র থেকে মধ্যদিন পর্যন্ত যেন আলোর জয়ন্তী—তেমনি শুক্লপক্ষে, উত্তরায়ণে। এগুলিকে বলতে পারি, যাগের অনুকূল কাল। বৈদিক যাগ বিশেষ করে আলোর এই উপচয়কে লক্ষ্য করে

অনুষ্ঠিত হত—উদ্দেশ্য চেতনায় আলোর সংস্কারকে পুষ্ট করা। চিজ্জ্যোতিই যদি ব্রহ্ম দেবতা এবং আত্মার স্বরূপ-লক্ষণ হয়, তাহলে এমনি করে প্রথমত বহিঃপ্রকৃতির সহায়ে আলোর সংস্কারকে পুষ্ট করতে পারলে ক্রমে তার মধ্যে স্বভাবের রীতিতে নেমে-আসা অন্ধকারকেও আমরা পরাভূত করতে পারি। যাগ তখন রূপান্তরিত হবে যোগে। সূর্যের মাধ্যন্দিন জ্যোতির দীপ্তি তখন আত্মাকে উদ্ভাসিত করে রাখবে বলে সূর্য ঢলে পড়লেও রাত এলেও আমার মধ্যে তার আলো অনির্বাণ হয়েই জ্বলবে। সঙ্গে-সঙ্গে কালমানের এককও (unit of time-measure) ব্যাপ্ত হবে অহোরাত্র থেকে মাসে, মাস থেকে ঋতুতে, ঋতু থেকে অয়নে। বেদে এই ব্যাপ্তি-সাধনার অনুকূল যাগ হল অগ্নিহোত্র দর্শপূর্ণমাস চাতুর্মাস্য এবং গবাময়ন। সংবৎসর হল কালমানের বৃহত্তম একক, কেননা নিসর্গে সংবৎসরকে ধরেই কতকগুলি বাইরের ব্যাপারের বারবার আবর্তন ঘটতে থাকে। এইজন্য বেদে সংবৎসরকে বলা হয়েছে প্রজাপতি বা প্রাজাপত্য সূর্য।

এখন যোগীর লক্ষ্য হল অনুকূল কালের সহায়ে চেতনায় আলোর সংস্কারকে প্রবল করে অন্ধকারকে পরাভূত করা, এমন ভূমিতে পৌঁছন যেখানে কেবলই আলো—আলো-অন্ধকারের আবর্তন তার নীচে। এর কথা আগেও বলেছি। উপনিষদে একে বলা হয়েছে 'সকৃদ্ দিবা'—যেখানে আদিত্য 'একল' তাঁর উদয়ও নাই অস্তও নাই।

এইখানে পৌঁছবার জন্যই প্রাকৃত জগতের অগ্নি এবং ধূম অথবা জ্যোতি এবং তমের মিশ্রণ হতে 'বিচয়ন' (ঋ. ৪।২।১১) করা বা পৃথক্ করে নেওয়া অগ্নিকে এবং জ্যোতিকে। প্রাণের তীব্র সংবেগে যে-যোগী তা পারেন, তিনি অগ্নি অহঃ শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণকে অবলম্বন করে আদিত্যমণ্ডল ভেদ করে যান—বিশেষত প্রয়াণকালে (৮।২৪)। যিনি তা পারেন না, আদিত্যের ওপারে আর যেতে পারেন না, তিনি

তার নীচে থেকেই ফিরে আসেন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, আদিত্যের ওপারে সব অক্ষয় লোক, আর আদিত্যের নীচের লোক-গুলি ক্ষয়িষ্ণু—চাঁদের কলার মত। এইজন্য উপনিষদে এবং এখানেও (৮।২৫) চেতনার এই অবর ভূমিকে বলা হয়েছে 'চান্দ্রমস-জ্যোতি'। আদিত্যের নীচে থেকে যোগী ফিরে আসেন, কিন্তু যোগভ্রষ্ট হলেও তিনি বিনষ্ট হন না (তু. ৬।৪০)। আবার তিনি এখান থেকে সংবেগকে তীব্রতর করে উজানপথে ধাওয়া করেন। আবার হয়তো ফিরে আসেন, আবার উজিয়ে চলেন। এই হল তাঁর 'আবৃত্তি'। আর যিনি সোজা আদিত্যমণ্ডল ভেদ করে চলে যান, তিনি আর ফিরে আসেন না, তাই তাঁর 'অনাবৃত্তি'। কিন্তু যোগীর এই 'আবৃত্তি' আর 'অনাবৃত্তি' দুয়ের মূলেই আছে 'উৎক্রান্তি' কিনা উজিয়ে যাওয়ার সংবেগ। এই উৎক্রান্তির ভাবনাই সংহিতায় ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে বিশেষ করে প্রপঞ্চিত হয়েছে।

গীতায় অনাবৃত্তিকে শুক্লগতি আর আবৃত্তিকে কৃষ্ণগতি বলা হয়েছে, আর বলা হয়েছে দুটি গতিই 'শাশ্বত' (৮।২৬)। শাশ্বত হলে পূর্ণ ব্রহ্মে দুটি গতিই আছে। কিন্তু তিনি আবার দুটি গতিরই উর্ধ্বে—ওই তাঁর পরম আদ্য স্থান (৮।২৮)। ওখান থেকে তিনি দুয়েরই ঈশ্বর অর্থাৎ যেমন তিনি অনাবৃত্তির তেমনি আবৃত্তিরও প্রশাস্তা। পরম স্থানে থেকে আবৃত্তির প্রশাস্তা বলে পুরুষোত্তমের বহু জন্ম সম্ভব (৪।৫, ৬, ৯)। পূর্ণযোগীও যখন এই দুটি 'সৃতি'কেই জানেন, তখন আর তাঁর মোহ থাকে না—আবৃত্তিতেও নয় (৮।২৭)। এইটি আধিকারিক পুরুষের বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন

গীতার নবম অধ্যায়কে 'রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং' (৯।২) কেন বলা হইল? 'জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং' (৯।১) শব্দদুইটির বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্যই বা কি? রাজ-বিদ্যা-রাজগুহ্য যোগকে '**প্রত্যক্ষাবগম**' কেন বলা হইয়াছে?

উত্তর

'জ্ঞান' সংজ্ঞাটি এখানে. সামান্যবাচী। দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সব-কিছু দিয়েই জ্ঞান হতে পারে। কিন্তু তাতে জ্ঞেয়বস্তুর সঙ্গে তাদাত্ম্য না-ও হতে পারে। জ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত তাদাত্ম্যজ্ঞান না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিজ্ঞানাভিমুখী নয়। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়ে গায়ে জোর করেছে।' আগের দুটা জ্ঞান, শেষেরটা বিজ্ঞান।

আবার 'বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়' অনুভব আছে (৬।২১)—আত্মা দিয়ে আত্মাকে আত্মাতে দেখা, যার ফল হল আত্যন্তিক সুখ এবং পরম তুষ্টি। এটি হল যোগসেবার ফলে চিত্তের বহির্মুখ বৃত্তির নিরোধ-জনিত আত্মানুভব। এটি বিজ্ঞান।

কিন্তু বিজ্ঞানের এই অন্তর্মুখীনতা এবং আত্মারামতাকে বজায় রেখেও বিষয়কে জানা যেতে পারে, তাকে অন্তরে আকর্ষণ করে আত্মস্বরূপে তার অন্তরঙ্গ আস্বাদনের দ্বারা। ভালবাসায় এটি সহজ হতেও পারে। এ-ও বিজ্ঞান, কিন্তু খুব গভীর বিজ্ঞান—বলা যায় 'প্রত্যক্ষাবগম' বিজ্ঞান। বিষয় তখন 'প্রত্যক্ষ' বা ইন্দ্রিয়গোচর, কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়গোচরতার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বিজ্ঞান বা 'বুদ্ধি'র দীপ্তি তখন ঝলক দিচ্ছে। এইটিই বৈদিক ঋষিদের 'চিন্ময়-প্রত্যক্ষ'—যা বাইরে অধিদৈবত-দৃষ্টি, আবার অন্তরে অধ্যাত্ম-দৃষ্টি, দুটিতে মিলে-মিশে একাকার।

এমনি করে কোনও-কিছু বাদ না দিয়ে তাঁকে আমাকে সবাইকে এক করে জানা এবং পাওয়া—চেতনার সকল ভূমিতে, এই হল 'রাজবিদ্যা' কি না বিদ্যার সেরা বিদ্যা। আর এ-বিদ্যা সবচাইতে গভীর এবং অন্তরঙ্গ বলে 'গুহ্যতম' এবং 'রাজগুহ্য'। ক্ষয় নাই বলে এ-বিদ্যা 'অব্যয়', বিশ্বের ঋতচ্ছন্দা প্রবৃত্তি এথেকেই উৎসারিত হয়েছে বলে এ 'ধর্ম্য'। আবার এ শুধু প্রপঞ্চোপশম অব্যবহার্য তত্ত্বমাত্র নয়, পরন্তু জীবনে অনায়াসে ফলিত—তাই 'সু-সুখং কর্তুম্'। অবশ্য

এই কৃতির স্বাচ্ছন্দ্য আসে তাঁর প্রসাদ থেকে, তিনি যখন নিজেকে প্রকট করে বলেন, 'এই দেখ আমি'। সে-দেখা মর্মাবগাহী হয়েই বহিরুৎসারী, তার ভিতর-বাইর সবটাই আলোময়। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় তখন 'চোখে ন্যাবা লেগে যায়', যা দেখি তাতে তাঁকেই দেখি, বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়রূপে নয় শুধু, প্রত্যক্ষাবগমরূপে। এই অধ্যায় থেকেই যে গীতার ভাবনায় একটা বিশিষ্ট মোড় নিয়েছে, সেকথা গোড়াতেই বলেছি।

প্রশ্ন

ভগবান্ অব্যক্ত মূর্তিতে বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত—কথাটার অর্থ কি (৯।৪)? অব্যক্ত মূর্তির ধারণা কিভাবে করিতে হইবে? 'ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ' (৯।৫)। ভগবানের এই যোগৈশ্বর্য বা অলৌকিকত্বের রহস্য কি? ভূতস্থ না হইয়াও 'ভূতভৃৎ' এবং 'ভূতভাবন' হওয়া যায় কিরূপে?

উত্তর

যা আমাদের বোধের বিষয়, তা ব্যক্ত। কিন্তু ঈশ্বর কিংবা তাঁর বিভূতি—কোনটাই আমরা সবটুকু বোধের মধ্যে আনতে পারি না। আমাদের বোধের বাইরে যা, তা অব্যক্ত। শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র বলেছেন, ভূতমাত্রেই 'ব্যক্তমধ্য' কি না তার আদি আর অন্ত দুই-ই অব্যক্ত, শুধু মাঝখানটুকু ব্যক্ত (২।২৮)। যেমন রামধনুর বর্ণালি—vibgyorএর উজানে ultra-violet, আর ভাটিতে infra-red, দুটির মধ্যে আমাদের দৃষ্টি সীমিত। কিন্তু আমরা দেখি না বলে ultra-violet বা infra-red যে নাই, তা তো নয়। চোখে না দেখেও অন্য উপায়ে বুঝি, তারা আছে। এমনি করে ঈশ্বর যেমন জগৎরূপে আমাদের কাছে ব্যক্ত, তেমনি আবার জগদতীতরূপে অব্যক্তও বটে।

বেদে ব্যক্তকে বলা হত সৎ, আর অব্যক্তকে অসৎ। ঋষি বলছেন, 'সৎ-এর বাঁধুনিটি রয়েছে অসৎ-এ—একমাত্র কবিরাই হৃদয় দিয়ে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে অবশেষে মনীষা দিয়ে তাকে জানেন

এবং পান।' মনীষা জানিয়ে দেয়, কিন্তু তার শেষ আছে। হৃদয় সেই অশেষকে পাইয়ে দেয়। যিনি জানেন যে তাঁকে নিঃশেষে জানা যায় না—কিন্তু পাওয়া যায়, বেদে তাঁকে বলা হয়েছে 'নবেদাঃ' কি-না সব জানা ফুরিয়ে দিয়ে যিনি তাঁকে পান। এমনি করে তাঁকে জানা এবং পাওয়াই হল রাজবিদ্যা। শুধু ব্যক্ত ব্রহ্মকে আঁকড়ে থাকা—তাঁর অনুত্তম পরম ভাবকে না বুঝে, এ হল অবুদ্ধির কাজ (৭।২৪)। কিন্তু লক্ষণীয়, অব্যক্ত বলে তিনি অমূর্ত নন। অব্যক্তেরও মূর্তি আছে—যে-মূর্তি দিব্যচক্ষুতে দেখা যায়। সে অদ্ভুত দর্শনের কথা পরে আছে (১১।৮)।

অব্যক্ত অথচ মূর্ত—এইভাবে তাঁকে পাওয়া হল রাজগুহ্য। একটি পাওয়া হল বিশ্বরূপে—বেদের পুরুষসূক্তের প্রথমেই যার কথা আছে। আরেকটি গুহ্যতম পাওয়া হচ্ছে মানুষী তনুতে তাঁকে পাওয়া—ওই বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তীর্ণ ভাবকে বোধস্থ রেখেই। তার কথাও পরে আছে (৯।১১)।

কোনও ব্যক্তমূর্তিতেই তিনি নিঃশেষিত হয়ে যাননি—এইভাবে সবসময় ব্যক্তকে ছাপিয়ে যাওয়া, সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভব করা হল অব্যক্তমূর্তির ধারণার উপায়। প্রথমত এই অব্যক্তমূর্তি প্রতিভাসিত হয় 'বৃহৎ জ্যোতিঃ' রূপে—যাকে বেদে বলা হয়েছে সকৃদ্‌বিভাতি। ওই জ্যোতির মধ্যেই আবার তনুকে দেখা যায়—ভাগবতের ভাষায় তা 'সত্ত্বতনু', যা সর্ববিধ ভাবতনুর সমাহার এবং অতনুর ঘনসার।

এখানে যে-মূর্তির কথা বলা হয়েছে তা তাঁর বিশ্বরূপ, পরে যা তিনি অর্জুনের দৃষ্টিতে প্রকট করবেন। এই প্রকটন তাঁর ঐশ্বরযোগ কিনা 'নিরোধের স্বর্ণচ্ছটা', অসৎ হতে সৎএর বিসৃষ্টি। এতে তাঁর ভূতভাবন মূর্তিটি পাওয়া গেল। এটি সামান্যত দর্শন। এরই বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়েছে একাদশ অধ্যায়ে, সেখানে ঐশ্বরযোগের কথা আবার আছে (১১।৮)। সেটি কিন্তু 'ইহ, অদ্য, মম দেহে' (১১।৭)।

এইটি রাজগুহ্য। এ-দেখা সবার ভাগ্যে হয় না— যোগমায়া তাঁকে আড়াল করে রাখেন (৭।২৫)।

তিনি 'ভূতস্থ' নন অর্থ—কোনও ভূতেই তিনি নিঃশেষিত নন। প্রকৃতিতে নিঃশেষিত বা নিমজ্জিত—এই অর্থে অন্যত্র 'প্রকৃতিস্থ' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় (১৩।২২, ১৫।৭)। নইলে অন্তর্যামিরূপে তিনি সর্বভূতের হৃদয়স্থ বৈ কি (১৮।৬১)। অন্তর্যামিরূপেই তিনি ভূতভৃৎ। কিন্তু ভর্তা ভূতকে ছাপিয়েও আছেন। ভূতের 'ভাবনা' বা বিসৃষ্টি তাঁর আত্মা হতে। আত্মা লোকোত্তর হয়েই অন্তর্যামী।

দুটি শ্লোকের মধ্যে আরেকটি রহস্য আছে। 'মৎস্থানি সর্ব-ভূতানি' বলেই শ্রীকৃষ্ণ আবার বলছেন, 'ন চ মৎস্থানি ভূতানি'। এই তাঁর এক আশ্চর্য ঐশ্বরযোগ বা যোগমায়া। বিশ্বাত্মকরূপে তিনি আমাদের বোধে যখন ধরা দিচ্ছেন, তখন সর্বভূতকে তাঁরই মধ্যে দেখছি—তিনি রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব (ঋ. ৬।৪৭।১৮)। কিন্তু আরেকটু উজিয়ে গেলেই অসম্ভূতির রাজ্য, সেখানে কিছুই হচ্ছে না, বেদের ভাষায় পরমব্যোমও সেখানে নাই। এটি নাসদীয় প্রজ্ঞানের ভূমি, সেখানে তিনি একল, নিষ্কেবল্য। তখন 'ন "চ" মৎস্থানি ভূতানি'।

দুটি যুগপৎ অনুভব করাই হল রাজবিদ্যা।

প্রশ্ন

'প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য' (৯।৮) কথাটির তাৎপর্য কি? ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর, আর জীবকে কেন তিনি মায়াধীন করিয়া পুনঃ পুনঃ সৃজন করেন? মায়াধীন জীব কি কখনও মায়াধীশ হইতে পারে না? তাহার উপায় বা সাধন-প্রণালী কি?

উত্তর

ভগবানের তিনটি প্রকৃতি—অপরা পরা আর এই স্বা বা স্বকীয়া প্রকৃতি। অপরা আর পরা প্রকৃতির কথা তিনি আগেই বলেছেন

(৭।৪-৫)। অপরা প্রকৃতির কাজ যান্ত্রিক—যদিও বুদ্ধিতত্ত্ব পর্যন্ত তার অন্তর্গত। সাংখ্য বলেন, যন্ত্রের পারার্থ্য আছে—সে যা করে, তা তার চাইতে 'পর' বা উৎকৃষ্ট কোনও তত্ত্বের জন্য করে। পাঞ্চভৌতিক দেহ মন অহঙ্কার আর বুদ্ধির যান্ত্রিক প্রবর্তনার উদ্দিষ্ট পুরুষ জীব। সে ভগবানের পরা প্রকৃতি। সোজাকথায় জগৎ আর জীব তাঁর অপরা আর পরা প্রকৃতি। এই দুটি বিধৃত রয়েছে তাঁর পরমা বা স্বকীয়া বা 'স্বা' প্রকৃতিতে। এই প্রকৃতিকে 'অবষ্টব্ধ' করে আর তাতে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি একদিকে যেমন ভূতগ্রামের বিসৃষ্টি করছেন (৯।৮), তেমনি আবার ধর্মসংস্থাপনের জন্য 'সম্ভূত' অর্থাৎ জগতে অবতীর্ণও হচ্ছেন, প্রকৃতির উর্ধ্বপরিণামের স্রোত যদি ব্যাহত হয় তাহলে তাকে মুক্ত করবার জন্য (৪।৬-৮)। বিসৃষ্টি হয় তাঁর বশে (তু. ঋ. বিশ্বস্য মিষতো বশী) ; কিন্তু যাদের বিসৃষ্টি হয়, তারা অবশ—এমন-কি প্রকৃতির বশ, ভগবান্ যে 'বশী' এ-জ্ঞানটুকুও তাদের নাই। এদের বলা হচ্ছে 'ভূতগ্রাম'। এদের মধ্যে যে-জীবসত্ত্ব, তা চেতন—ধীরে-ধীরে তার চেতনার 'উন্মেষ' হচ্ছে, একথা বেদের ওই উদ্ধৃতিতেই আছে। জীব যদি চিরকাল মায়ার অধীন থাকত, তাহলে কেন তাকে মায়াধীন করা হল এ-আক্ষেপ করা চলত। কিন্তু তিনি তো অপরা প্রকৃতির বাঁধন তিলে-তিলে খসিয়েই চলছেন। বাঁধন যখন খসে পড়ে, তখন জীব প্রকৃতি হতে বিবিক্ত, স্বরূপে অবস্থিত। তখন সে অপরা প্রকৃতির ঈশ্বর। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির ঈশ্বর নয়। ব্রহ্মসূত্রে তাই বলা হয়েছে, জীব ব্রহ্ম হলে ভোগসাম্য ঘটতে পারে, কিন্তু শক্তিসাম্য ঘটে না—জগদ্ব্যাপার বাদ দিয়ে তার ব্রহ্মের সঙ্গে সাম্য। এই দৃষ্টিতে জীবকে কখনও মায়াধীশ বলা চলে না। মায়ার অধীশ্বর অর্থাৎ তার উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর হলেন পরমাত্মা বা পরমপুরুষ (১৩।২২)। তিনি এই দেহেই আছেন এবং তাঁর সঙ্গে মুক্ত জীবের কথঞ্চিৎ সাম্য আছে—যাকে গীতায় বলা হয়েছে তাঁর 'ভাব' বা 'সাধর্ম্য' লাভ করা (৪।১০, ৮।৫, ১৪।১৯, ১৪।২)। জীব

ব্রহ্ম লাভ করে 'মায়াতীত' হতে পারে। যতক্ষণ তা না করছে, ততক্ষণ সে 'মায়াধীন'। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই সে 'মায়াধীশ' নয়। এই সংজ্ঞাটি ভগবানের জন্য তুলে রাখাই ভাল।

মায়া আর প্রকৃতির সূক্ষ্ম তফাত আছে। মায়া শব্দটি বেদের, আর প্রকৃতি শব্দটি সাংখ্যের। স্বতঃপরিণাম প্রকৃতির সাধারণ লক্ষণ। বেদে কিন্তু মায়া প্রজ্ঞাশক্তি। এইজন্য সাংখ্যের প্রকৃতি অচেতন, কিন্তু বেদের মায়া চিন্ময়ী। ভগবান্ যখন বলেন, 'আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে আত্মমায়া দ্বারা সম্ভূত হই' (৪।৯), তখন প্রকৃতির ক্রিয়াশক্তি আর মায়ার প্রজ্ঞাশক্তির দিকটা বেশ ফুটে ওঠে। মায়া 'প্রজ্ঞা পুরাণী', তিনি সব দেখেন; আর প্রকৃতি 'প্রকরোতি সর্বম্', সব করেন। ভগবানের স্বীয়া প্রকৃতি আর আত্মমায়া তাঁর স্বরূপশক্তির অন্যোন্যসঙ্গত দুটি দিক।

যিনি মায়াধীশ, তিনি আর জীব নন—শিব। নিতান্তই যদি তাঁকে 'জীব' বলতে চাও তো বল তিনি 'একজীব'—বেদে যাকে বলা হয়েছে 'জীবো অসুঃ'।

বর্তমান প্রসঙ্গে বিসৃষ্টির ফলিত দিকটা দেখানো হচ্ছে, তাই মায়া এখানে উহ্য, প্রকৃতিই পুরোধা।

প্রশ্ন

ভাবই মূর্তি পরিগ্রহ করে। মানুষী তনু আশ্রয় করিলেও ভগবানের ভূতমহেশ্বর এবং 'পরং' ভাব অব্যাহতই থাকে। পরমভাবের দিকে লক্ষ্য বা দৃষ্টি থাকে না বলিয়াই সাধারণ লোক ভগবান্‌কেও মানুষ বলিয়া অবজ্ঞা করে (৯।১১)। ভগবানের সর্বভূতমহেশ্বর এবং পরম ভাবের একটু বিশ্লেষণ করিলে ভাল হয়। মানুষী তনু হইলেও ভগবানের ভাব-তনুই তো স্থূলে ব্যক্ত?

উত্তর

'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ'—এই শ্লোকটিতেই গীতার রাজবিদ্যা এবং রাজগুহ্য ব্যক্ত হয়েছে, যা নাকি 'গুহ্যতমং জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্' এবং 'প্রত্যক্ষাবগমম্' (৯।১,২)। এই অনুশাসনের পর হতেই গীতার

তাৎপর্য আরও গাঢ় হয়েছে। শ্লোকটিকে গীতার মধ্যমণি বলা যেতে পারে।

এতক্ষণ যিনি শাস্তা হয়ে প্রবক্তা হয়ে অনুশাসন করছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে অর্জুনের ভগবদ্‌বুদ্ধি কিছুটা আবছা ছিল—যেমন মানুষ-গুরুর বেলায় আমাদেরও থাকে। তখন 'গুরুই ভগবান্' একথা আমরা মুখেই বলি—মূঢ়ের মত। গুরু কি তা-ও জানি না, ভগবান্ কি তা-ও জানি না। সুতরাং উক্তিটা হয় অবিদ্যা-মানসের ভূমি হতে, মানসোত্তর ভূমি হতে নয়। গুরু বা ভগবান্ সম্বন্ধে এটা 'প্রজ্ঞা' বা 'অভিজ্ঞা' নয়—'অবজ্ঞা' (অবজানন্তি) কি-না তাঁকে খাটো করে জানা, পুরাপুরি না জানা। এর মূলে আছে আমাদের মোহ (মূঢ়াঃ) অথবা অবিদ্যা। অথবা তাঁর দৈবীমায়া (৭।১৪), অথবা যোগমায়া (৭।২৫)। ভগবান যেন তাঁর আর আমার মধ্যে একটা আলোর আড়াল রচনা করেন—তাতে তাঁকে খানিকটা জানি, খানিকটা জানি না। আভাসে হয়তো-বা বুঝি, কিন্তু প্রভাসে পাই না।

এই যোগমায়া কিন্তু 'দৈবী' মায়া, 'আসুরী' মায়া নয়—এটা লক্ষণীয়। অতএব আবৃত করাই তার কাজ নয়, বরং তার কাজ ধীরে-ধীরে প্রকাশ করা।

আমাদের মোহজনিত অবজ্ঞা বা তাঁর যোগমায়া আমরা নিজেরা সরাতে পারি না। এক পরম লগ্নে তিনিই তা সরিয়ে দিয়ে বলেন, 'দেখ, তোমার সামনে আমি প্রকাশিত—মানুষী তনুকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত।'

তখন এই সাদা চোখেই তাঁকে দেখতে পাই, ছুঁতে পাই, শুনতে পাই। যেমন গোপীরা পেত। একে বলে চিন্ময়-প্রত্যক্ষ—যা প্রত্যক্ষের সেরা। বেদে একেই বলা হয়েছে অধিদৈবত-দৃষ্টি।

কিন্তু বৈদিক দৃষ্টি আর ভাগবত দৃষ্টির ধরন এক হলেও দুয়ের বিবৃতিতে একটু সূক্ষ্ম তফাত আছে। আকাশে বাতাসে আলোয় অন্তরিক্ষে পৃথিবীতে সর্বত্র তাঁকে দেখা—অধিষ্ঠান এবং অন্তর্যামি-রূপে

—এ-দর্শন সামান্য দর্শন। আর বিশিষ্ট দর্শন হল তাঁকে 'পুরুষ' রূপে দর্শন। আমি পুরুষ। তিনিও যদি পুরুষ হয়ে আমার কাছে প্রকাশ না পান, তাহলে আমার সর্বেন্দ্রিয়রসায়ন দর্শন হল কোথায় ? আর শুধু অন্তরাবৃত্ত চক্ষুতে তাঁকে ভাবরূপে দেখাই নয়, চাই তাঁকে বস্তুরূপে পরাক্-বৃত্ত চোখ দিয়ে দেখতে। আবার এ-দেখা শুধু বহির্দৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর স্বরূপকেই দেখা নয়—রূপকেও দেখা। এ সম্ভব হয়, যদি তিনি মানুষী তনুকে আশ্রয় করে আমার গোচর হন, আমার 'প্রত্যক্ষাবগম' হন। তখনই আমার জ্ঞান বিজ্ঞান-সহিত গুহ্যতম জ্ঞানে পরিণত হবে।

এখন মানুষী তনুকে আশ্রয় করে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন, আবার অর্জুনের সামনে আর গোপীর সামনেও হচ্ছেন। এর মধ্যে শিশুপাল শুধু মানুষী তনুকেই দেখছে, তাকে আশ্রয় করে কে তার সামনে প্রকাশিত, তা জানছে না। এটা নিরেট মূঢ়ের অবজ্ঞা।

অর্জুন কতকটা আন্দাজ করতে পারছেন, এই মানুষটি 'গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ'—কিন্তু কিরকম যে মানুষ, তা ঠিক ধরতে পারছেন না, কেননা তাঁর পরম ভাব সম্বন্ধে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতা নাই। এ-ও মূঢ়ের অবজ্ঞা। এ জ্ঞান হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান নয়।

আর গোপীর যে-দেখা, সেইটাই হল অভিজ্ঞতা বা প্রজ্ঞা।

এখন, এই প্রজ্ঞার দর্শন হয় তিন ভূমিতে—বিগ্রহে, বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে। বিগ্রহে তিনি 'মানুষীং তনুম্ আশ্রিতঃ'। বিশ্বে তিনি—'বিশ্বরূপ ভূতমহেশ্বর'। ঋক্‌সংহিতার পুরুষ-সূক্তে তার বিবৃতি আছে, গীতার দশমাধ্যায়েও আংশিকভাবে আছে। আর বিশ্বাতীতে তিনি 'পর', অবাঙ্‌মানসগোচর, অক্ষর।

এই শেষের দুটি 'ভাব' না জেনে শুধু 'মানুষী তনু'তে তাঁকে দেখাও অবজ্ঞা। এই অবজ্ঞা শুধু অজ্ঞানী বা অভক্তেরই নয়—জ্ঞানী এবং ভক্তেরও থাকতে পারে।

এই দর্শনের আবার আরোহ এবং অবরোহ-ক্রম আছে। আরোহ-ক্রমে প্রথম আত্মদর্শন, যাতে তাঁকে দেখবার যোগ্যতা জন্মায়। তখন তিনিই চোখ খুলে দেন—অন্তর থেকে তাঁকে বাইরে দেখি ভূতে-ভূতে। দেখতে-দেখতে আর কূল পাই না, সব যেন তখন শূন্যে মিলিয়ে যায়। এই হল বেদের ভাষায় 'পরমা সংদৃক্', এখানে যাকে বলা হয়েছে 'পর ভাব'। তারপর তাঁরই প্রসাদে শূন্যতা ঘনীভূত হয় আদিত্যে, সহস্ররশ্মিতে তা পরিকীর্ণ হয়ে পড়ে। সেই পরিকীর্ণ রশ্মির দুটি প্রত্যন্তে আবার সবিগ্রহরূপে তাঁকে দেখতে পাই। এই দেখা অবরোহ-ক্রমে। প্রথমটি অক্ষর-পুরুষের দর্শন, দ্বিতীয়টি ক্ষর-পুরুষের দর্শন (এই দর্শনেই ইদং আর ব্রহ্ম একাকার) এবং শেষেরটি পুরুষোত্তমের দর্শন। পর এবং ভূতমহেশ্বর ভাব সম্পুটিত হয়ে আছে পুরুষোত্তমে।

প্রশ্ন

'দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ' (৯।১৩) মহাত্মাগণ ভগবানের অব্যয় অবিনাশী তত্ত্ব অবগত হইয়া অনন্যচিত্তে তাঁহার ভজনা করিয়া থাকেন। জানার পর আবার ভজন-মার্গ আশ্রয় করিতে হয়? জানিয়া ভজন করেন মহাত্মাগণ। সর্বসাধারণ তো না জানিয়াই ভজন করে—তাহাতে কি কোন ফল হয় না?

উত্তর

ভগবান এখানে দুটি প্রকৃতির কথা বলছেন। একটি মোহিনী, আরেকটি দৈবী। মোহিনী প্রকৃতি আবার দুরকম—একটি রাক্ষসী, আরেকটি আসুরী (৯।১২)। রক্ষ অসুর দেবতা—চেতনার ক্রমিক উন্মেষে তিনটি সত্ত্বের তিনটি ভূমির কথা বেদে খুব স্পষ্টভাবেই আছে। রক্ষঃশক্তি বা রাক্ষসী প্রকৃতি পৃথিবীতে বা তার কাছাকাছি। তাকে পরাভূত করেন যে-দেবতা, তিনি 'রক্ষোহা অগ্নি'। আসুরী প্রকৃতির মুখ্য আশ্রয় অন্তরিক্ষলোক। তাকে পরাভূত করেন 'বৃত্রহা ইন্দ্র'। দ্যুলোকে দিব্য প্রকৃতি—বিশ্বদেবগণে যার প্রকাশ। তারও ঊর্ধ্বে ভগবানের পরম ধাম, বিষ্ণুর পরম পদ।

এই পরম ধামে তিনি অব্যয় বা অক্ষর। তাঁর ক্ষরণ নাই, আবার আছেও। বেদ তাই বলছেন, 'ক্ষরত্যক্ষরম্'—অক্ষরেরও ক্ষরণ হয়। উপনিষদ্ বলছেন, এ যেন আদিত্যের ক্ষোভ, তার মধ্যে আলো টলমল করছে। অথচ অমনিতে আলো নিশ্চল।

যেখানে তিনি অটল, সেখানে তাঁকে বলি অব্যয়। আর অটল থেকেই যেখানে টলমল করছেন, সেখানে তিনি ভূতাদি বা ভূতমহেশ্বর (৯।১১)। একটা অসম্ভূতি, আরেকটা সম্ভূতি—দুটা ভাবই সত্য এবং যুগপৎ সত্য। উপনিষদে দুটি ভাবের সহবেদনের কথা আছে। আর বেদে বলা হয়েছে, পুরুষের একপাদ সর্বভূত, আর তাঁর ত্রিপাদ অমৃত। অর্থাৎ তাঁর বারোআনা অব্যয়, চারআনায় ক্ষোভ। এইটি আমাদের জীবনেরও ছন্দ।

এই যে অব্যয় ভূতাদি, তাঁর শক্তি হল মায়া—বৈদিক অর্থে যা 'প্রজ্ঞা প্রসৃতা পুরাণী'। এই মায়ার অভিব্যক্তি প্রকৃতিতে। এই প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। যখন শুদ্ধ-সত্ত্ব, তখন সে দৈবী। আর যখন মলিনসত্ত্ব, তখন সে মোহিনী। মোহিনী প্রকৃতি রজোগুণে আসুরী, তমোগুণে রাক্ষসী।

তিনটি প্রকৃতিই আমাদের মধ্যে আছে। মোহিনী প্রকৃতিতে আমাদের আশা নিষ্ফল, কর্ম নিষ্ফল, জ্ঞান নিষ্ফল, আমরা 'বিচেতাঃ' কিনা অবিদ্যাচ্ছন্ন। দেহে যোগের আগুন জ্বালিয়ে আর প্রাণে বজ্র-শক্তি (ওজঃ) নামিয়ে এনে যদি মোহের ঘোর আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি, আমরা তাহলে 'মহাত্মানঃ'। তখন আমাদের প্রকৃতি দৈবী প্রকৃতি।

এই মহাত্মাদের কাছেই তাঁর মানুষী তনু প্রকট হয়—যিনি অব্যয় এবং ভূতাদি, তিনি যে সবিগ্রহও এই রাজগুহ্য রাজবিদ্যা তাঁদের কাছে ধরা পড়ে। 'বিচেতাঃ'রা কিন্তু এই গুহ্যতম জ্ঞানের কোনও খবর রাখে না।

কিন্তু জ্ঞান হলেই সাধনা শেষ হয় না। নুনের পুতুল সমুদ্রে মিশে গেল—এ হতে পারে বটে। কিন্তু নুন জমাট বেঁধে সে যদি পাথর হয়ে যায়? রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সচ্চিদানন্দসমুদ্র ভক্তিহিমে বরফ হয়ে গেল, অর্থাৎ তিনি সবিগ্রহ হলেন। কার কাছে, না সবিগ্রহ ভক্তের কাছে। নুনের পুতুল অবিগ্রহ জ্ঞানী, সে গলে যায়। কিন্তু নিত্যসৈন্ধবঘন পুতুল তো গলে না—সে ভক্ত। তার ভজন আছে, রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'অব্ হম্ তোম্ বিলাস' আছে। গীতার উর্জিতা ভক্তির পর ভাগবতের প্রেমভক্তি আছে। ওই রাজগুহ্যের ইঙ্গিত এইখানে।

যারা মূঢ়, তাদের 'ভজন' বৃথা হয় না। ভক্তিতে, ভালবাসায় যে অনন্যমানস, তাঁকে ছাড়া যে আর-কিছুই দেখে না বা বোঝে না, সে যদি সুদুরাচারও হয়, তাহলেও সে 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা'…'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'—এ-আশ্বাস তিনি পরেই দিয়েছেন (৯।৩০-৩৩)।

তবে কিনা অনন্যমনা হওয়া চাই। আর অনন্যমনস্তই হল যোগ। জ্ঞানীর যোগ নিরোধাভিমুখী, আর ভক্তের যোগ একাগ্রতা-মুখী। একটা উজিয়ে যাওয়া, আরেকটা ভাটিয়ে আসা। উজিয়ে গিয়ে আবার ভাটিয়ে আসা—তবেই বলা চলে 'বাসুদেবঃ সর্বম্'।

প্রশ্ন

জ্ঞানযজ্ঞেরও বহু প্রকার আছে। 'একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্' (৯।১৫)—প্রত্যেকটি শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে সকলের জন্য ভগবান্ এক পন্থা নির্বাচন করেন নাই।

উত্তর

'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—এই জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান। কিন্তু বস্তুত এই জ্ঞান মনোভূমির ওপারে—বিজ্ঞানভূমিতে। এ-জ্ঞান শুধু সমাধির প্রপঞ্চোপশম একরসপ্রত্যয়ই নয়—ব্যুত্থানে প্রপঞ্চোল্লাসেও জ্ঞান অটুট থাকবে। তাঁকে যেমন দেখব স্বরূপে, তেমনি বিভূতিতে।

স্বরূপে তিনি এক, বিভূতিতে বহু। বিভূতিতে তাঁর গুণ আর কর্মের লীলায়ন। তখন তাঁকে দেখি 'বহু-ধা' কিনা বহু রকমে বিভাত। এ কথাগুলি বিভূতিযোগের ভূমিকা। এর পর অদ্বৈতজ্ঞান নিয়েই কুরুক্ষেত্রে ধার্তরাষ্ট্রদের বধ করতে হবে কিনা—এখন থেকে তারই প্রস্তুতি চলছে।

'একত্বেন' আর 'বহুধা'—যেন যুগপৎ তাঁর যজন। একেরই যজন করছি বহু বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে। বৈচিত্র্যে বিরোধ থাকে না, থাকে সৌষম্য। যেমন পাঁচফুলের সাজি। সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড সুষমা।

একে যদি মনের রাজ্যে নামিয়ে আনি, সাজির একেকটি ফুল আলাদা করে নিয়ে তার বাহার দেখি, তাহলে সেটি হবে 'পৃথক্‌ত্বেন' দেখা। তখন কিন্তু রজোগুণের প্রবৃত্তি হয়েছে বুঝতে হবে (দ্র. ১৮।২১)। সেখানে 'পৃথক্‌ত্বেন' জানলে তা রাজস জ্ঞান বলা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানযোগীর তখনও একত্বের বিজ্ঞান অটুট থাকে, কেবল ব্যবহারের অনুরোধে পৃথক্‌ত্বের ভান এবং অঙ্গীকার।

কিন্তু পৃথক্ করে, সবার কাছ থেকে আলাদা করে সরিয়ে নিয়ে যেটিকে দেখছি, যদি তার মধ্যেই আবার সবার আভাস পাই, শরৎচন্দ্রের পণ্ডিত মশাইয়ের মত এক চরণের মধ্যেই যদি বিশ্বের সব ছেলের প্রতিরূপ দেখি, অথবা আমার ইষ্টেই যদি সবার ইষ্টের সমাবেশ আর স্ফুরণ দেখি, তবে সে হবে 'বিশ্বতোমুখকে' দেখা। এই দেখাতেই পৃথক্‌রূপে দেখার ঘুর্ণ কেটে যায়। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় তখন সবার মধ্যেই তাঁকে দেখি, সঙ্গে-সঙ্গে দেখি শক্তিবিশেষ নিয়ে তাঁর প্রকাশ। আবার সেই শক্তিবিশেষেই শক্তির অনন্ত বিভূতির ব্যঞ্জনা। এইটি বিশ্বরূপদর্শনের ভূমিকা।

সব দর্শনগুলিই ওতপ্রোত। তবে রুচি সংস্কার আর সামর্থ্য-ভেদে একেকজন একেকটাকে বেছেও নিতে পারে। কিন্তু একদেশী জ্ঞানকে ছাপিয়ে সম্যক্ জ্ঞানে পৌঁছনই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রশ্ন

'অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন' (৯।১৯)—মৃত্যু-অমৃত, সৎ-অসৎ সব রূপেই তিনি। মৃত্যু অতিক্রম করিয়াই কি অমৃত-চেতনা লাভ করিতে হইবে? সৎ এবং অসৎ কাহাকে বলে? ইহ-জীবনে কি অমৃতত্ব লাভ করা যায় না? জীবন্মৃত হইয়াই কি জীবন্মুক্তি লাভ করিতে হয়?

উত্তর

যা-কিছু অনুভব-গোচর—তা-ই 'আছে', তা-ই 'সৎ'। এই অর্থে বেদে 'সৎ' শব্দের অনেক ব্যবহার আছে। গীতাতেও 'সদ্ভাবে' সৎ শব্দের প্রয়োগের কথা আছে (১৭।২৬)।

কিন্তু আমাদের অনুভব সীমিত। সীমার বাইরেও একটা-কিছু আছে, এমনতর অস্পষ্ট বোধ অবশ্য হয়। কিন্তু তা যে কি, তা বলতে পারি না। সৎএর অতীত ওই অনির্দেশ্য তত্ত্বকে বলা হয় 'অসৎ'। এই অর্থেও বেদে শব্দটির ব্যবহার আছে। এমনও বলা হয়েছে, 'অসতঃ সদ্ অজায়ত'—অসৎ হতে সৎএর জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের সীমিত বোধের উৎস এক অসীম অনির্বচনীয় তত্ত্ব।

এই অনির্বচনীয় তত্ত্বকে আবার বেদের নাসদীয়-সূক্তে বলা হয়েছে, তাকে সৎও বলা চলে না, অসৎও বলা চলে না। এখানে বলা হচ্ছে পরম-পুরুষ সৎ এবং অসৎ দুই-ই। দুটি উক্তিতে কোনও বিরোধ নাই। সৎ আর অসৎ আমাদের বিচার। তিনি আমাদের বিচারের আওতায় পড়েন না—অতএব তিনি স্বরূপত সৎও নন, অসৎও নন। কিন্তু আমাদের বিচারও তো আসছে তাঁর মধ্যে থেকেই। কাজেই তিনি সৎও আবার অসৎও। অর্থাৎ তাঁকে অনুভবে বেড়ে পাই যেমন, তেমনি আবার দেখি, সব অনুভব ছাপিয়েও তিনি, তাঁকে বেড়েও পাওয়া যায় না। তিনি কি তা মুখে বলা যায় না।

আমাদের কাছে যা সৎ, তার দুটি রূপ। একটি প্রবাহরূপ, আরেকটি শাশ্বতরূপ। যা প্রবাহরূপে, তাতে ঢেউএর ওঠা-পড়া

আছে। এটাই প্রভব এবং প্রলয় (৯।১৮)। অথচ সবশুদ্ধ প্রবাহটা কিন্তু নিত্য। প্রলয় মৃত্যু, আর প্রভব এবং প্রলয়ে অনুস্যূত শাশ্বত সত্তা অমৃত। একেই বলা হয়েছে 'স্থানং নিধানং বীজম্ অব্যয়ম্' (৯।১৮)। আবার প্রভব ও প্রলয়ের উর্ধ্বে একটি শাশ্বতী স্থিতি আছে। তা-ও অমৃত।

ব্রহ্মই অমৃত। যেখানে সম্ভূতি নাই, সেখানে তিনি অমৃত। তখন 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' (ঋ. ১০।৯০।৩)। আর এই অমৃত হতে সম্ভূতি ও বিভূতির যে-লীলা, শক্তিপ্রবাহরূপে তা-ও অমৃত।

মৃত্যু হতে এই অমৃতে পৌঁছনই আমাদের লক্ষ্য।

অমৃতে পৌঁছলে দেখি জন্ম আর মৃত্যু অমৃতের বুকেই তরঙ্গের মত। বিশেষ একটি তরঙ্গের উদয়-বিলয় আছে, কিন্তু তরঙ্গধর্মটি নিত্য। এই ধর্মের বোধটি শক্তির বোধ। শক্তির উন্মেষ-নিমেষ থাকলেও শিবকে আশ্রয় করে তার নিত্যতা আছে।

নিত্যতত্ত্বের অনুভূতিকে জীবনে নামিয়ে আনতে পারাই জীবন্মুক্তি। তা জীবন্মৃতত্ব হবে কেন? তবে মুক্ত অবস্থাতে আমি নিশ্চল থাকতে পারি—তখন আমাকে মনে হবে শববৎ। কিন্তু তখনও আমি শিব।

অতএব 'জীবন্মুক্তের মধ্যে জীবনের উল্লাস থাকবেই' এ-আগ্রহ কেন? ব্যাপারটা আসলে বোধের ব্যাপার। সেখানে অক্ষরের ক্ষরণ, অস্পন্দের স্পন্দ, এইসব আপাতবিরোধী অবস্থা দেখা দিতে পারে। বরফের চূড়াকে বাইরে থেকে মনে হয় নিশ্চল। কিন্তু জাহ্নবী তারও মধ্যে ফল্গুধারায় প্রবাহিতা। সুতরাং জীবন্মুক্তের যে-অবস্থাকে আপাতদৃষ্টিতে জীবন্মৃত্যু মনে হচ্ছে, তা-ও অমৃত হতে বাধা নাই।

প্রশ্ন

সোমপানে অমৃতত্ব লাভ হয়, যাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন, তাঁহাদিগকেও কি আবার গতাগতির আবর্তে নিপতিত হইতে হয় (৯।২০-২১) ? যজ্ঞাবশেষ-ভোজীকেও যদি আবার সাধারণের মতই আবৃত্তির পথে গতাগতি করিতে হয়, তবে সোমযাগ করিয়া লাভ? যজ্ঞ দ্বারা তাহা হইলে অমৃতত্ব লাভের কোনও আশাই নাই? সোমপানের অমৃতত্ব কি আপেক্ষিক?

উত্তর

'অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম'—সোমপান করলাম আমরা, আমরা অমৃত হলাম। এটি বৈদিক ঋষিরই ব্রহ্মঘোষ। অমৃতত্ব কি রকম? না, তার পরেই আছে, 'অগন্ম জ্যোতির্ অরিদাম দেবান্'—আমরা পৌঁছলাম জ্যোতিতে, পেলাম বিশ্বদেবগণকে। এই জ্যোতিকে তাঁরা বলতেন 'বৃহৎ জ্যোতিঃ'—আমরা এখন বলি 'ব্রহ্মজ্যোতিঃ'। আর বিশ্বদেবগণ সেই ব্রহ্মজ্যোতিরই ছটা। গীতার ভাষায় একটি তাঁর পরম ভাব, আরেকটি তাঁর ভূতমহেশ্বর ভাব।

কিন্তু সোমযাগের এই উত্তম ফল সবাই লাভ করতে পারে না। তাই ওই বেদই বলছেন, 'ওষধি সোমকে ছেঁচে লোকে মনে করে, আমরা সোমপান করলাম। কিন্তু ব্রহ্মবিৎ যে-সোমের খবর রাখেন, তার রস কেউ খায় না।'

তাহলে সোমযাগ দুরকমের—একটা বহির্যাগ, আরেকটা অন্তর্যাগ। ছান্দোগ্যে আছে, 'কেউ যজ্ঞ করে জেনে, কেউ না জেনে। জানা আর না জানার ফল আলাদা। যে বিদ্যা শ্রদ্ধা এবং উপনিষৎ বা দেবাবেশ-সহকারে যজ্ঞ করে, তারই কর্ম বীর্যবত্তর হয়।'

শ্রদ্ধা রহস্যজ্ঞান আর আবেশ নিয়ে সোমযাগ করলে পরাবর ব্রহ্মকে লাভ করা যেতে পারে। সেই হল সত্যকার অমৃত হওয়া। এতটা যে করতে পারে না, তার যে একেবারে কিছু হয় না, তা নয়। যজ্ঞ করতে গিয়ে তার দেহ প্রাণ মন শুদ্ধ হয়। ওই শুদ্ধ দেহ-প্রাণ-মনে যে-আলো ফোটে—পাপের মালিন্য কেটে যাওয়ায়, তাতে সে

পায় স্বর্গলোক, উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে 'মনোজ্যোতিঃ'। সপ্তব্যাহৃতির তৃতীয় ব্যাহৃতি তার বীজমন্ত্র। ওতে মনের চূড়ায় ওঠা যায়, কিন্তু তারও পরে যে মহর্লোক বা বিজ্ঞানভূমি আছে, তার আভাস পেলেও তাতে স্থিতিলাভ হয় না। তখন মাধ্যাকর্ষণের টানে আবার নীচে নেমে আসতে হয়।

মনে কর, সূর্যের দিকে একটা রকেট ছুঁড়ে দেওয়া হল। সেটাকে সূর্যও টানবে, আবার পৃথিবীও টানবে। একটা মধ্যবিন্দু আছে, যেটা পার হয়ে গেলে রকেটটা গিয়ে সূর্যে পড়বে। মহর্লোক সেই মধ্যবিন্দু। রহস্যবিজ্ঞান এবং উপনিষৎ না জেনে যারা যজ্ঞ করে, তারা ওই মধ্যবিন্দুটা পার হতে পারে না। দম ফুরিয়ে গেলে আবার তাদের নেমে আসতে হয়। তাই তাদের গতাগতি থেকেই যায়।

শ্রীকৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরসের কাছে শিখেছিলেন, সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ। এই বাদের নাম হচ্ছে 'পুরুষযজ্ঞ-বাদ'। গীতায় তিনি এই যজ্ঞের কথাই বলেছেন—জীবনযজ্ঞের কথা। যজ্ঞে দেবতাকে সব দিতে হয়, নিজের জন্য কিছুই রাখতে নাই। আমার আনন্দই জীবনের সোমরস। তাঁকে নন্দিত করেই আমার আনন্দ। এই হল সত্যকার সোমযাগ—আমার জীবনের সৌম্য মধু তাঁকে পান করানো। তখন তো আমি বেদবাদরত কামাত্মা হয়ে (২।৪২, ৪৩) যজ্ঞ করি না। তখন চেয়ে আমার আনন্দ নয়—দিয়েই আনন্দ। সেই আনন্দ দেবতাকে নন্দিত করে শতগুণ হয়ে আমার কাছে ফিরে আসে। ওই হল যজ্ঞশিষ্ট অমৃতপান বা ইড়াভক্ষণ। তার ফলশ্রুতি প্রথমেই উল্লেখ করেছি।

শ্রীকৃষ্ণ এই যজ্ঞই করতে বলেছেন গীতায়। তার ফলে তাঁকে আমার সব দিয়ে আবার তাঁকেই বুক ভরে ফিরে পাই। এই হল সত্যকার সোমযাগ, আর তার ফলে সত্যকার অমৃতত্ব লাভ।

প্রশ্ন

'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'—এই প্রতিশ্রুতি তো সকলের জন্য নহে? 'অনন্য চিন্তা' বলিতে কি বুঝিব? 'যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্' (৯।২২-২৩) কথাটার তাৎপর্য কি? বিভিন্ন ইষ্টদেবতার মধ্যে অভিন্ন এক ঈশ্বরই তো বিরাজমান?

উত্তর

'যোগ-ক্ষেম' একটি পারিভাষিক শব্দ। ঋগ্বেদেও তার ব্যবহার আছে (৫।৩৭।৫, ৮।৩৭।৫, ১০।১৬৬।৫)। বোঝায় 'অভ্যুদয়'কে। অলব্ধ বস্তুর অর্জন হল 'যোগ', আর লব্ধ বস্তুর রক্ষণ 'ক্ষেম'। বেদে তার রহস্যার্থ হল প্রযত্ন এবং পুষ্টি।

অভ্যুদয়কে ছাপিয়ে নিঃশ্রেয়স। নিঃশ্রেয়স মানে 'যার বাড়া শ্রেয় আর নাই।' তা হল পরমার্থ, ঈশ্বরপ্রাপ্তি। ঈশ্বরকে চাওয়া আর এখানকার সম্পদকে চাওয়ার মধ্যে একটা বিরোধ আছে। এখানে যে চায়, ওখানকার কথা সে ভুলে থাকে। আবার তাঁকে যে চায়, তার জগৎ ভুল হয়ে যায়।

অভ্যুদয়ের মূলে আছে বিত্তৈষণা, লোকৈষণা। এখানে ধন-দৌলত তো পাবই, পরলোকে গিয়েও ভোগের অভাব হবে না। এই বুদ্ধি 'কামকাম' (৯।২১) বা 'কামাত্মা'র (২।৪৩)। তারা মনের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। কিন্তু তাঁকে যারা চায়, তাদের স্থিতি বিজ্ঞান আর আনন্দের ভূমিতে—মনেরও ওপারে। ওখানকার টানে তারা এদিককার কথা ভুলে যায়। কিন্তু দেবতা তা ভোলেন না। তিনি তাদের যখন যেটুকু দরকার, তা জুটিয়ে দেন। কি দরকার তা তারা বোঝে না, তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। তারা 'যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট' (৪।২২)। তাদের প্রয়োজন বোঝেন দেবতা।

দেবতার এই বোঝার কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় হল বাইরের বস্তু। বাইরের বস্তুতে অন্তরের সুখ—আমরা এই বুঝি। কিন্তু দেবতা বোঝেন, অন্তরারাম হওয়াটাই আসল কথা। তাই বাইরে যা-ই ঘটুক না কেন, তাতে অন্তর উদ্দীপ্ত হবে—এইটি তিনি চান।

কিন্তু তাঁর এই চাওয়াতে আমাদেরও সহযোগিতা চাই। আমরা যদি অন্তরারাম হতে চাই, তবে তিনি বাইরের যে-কোনও উপলক্ষ্য অবলম্বন করে অন্তরে সুধার তরঙ্গ তোলেন। জ্ঞানী-ভক্তের তখন এই ভাব, 'তুমি যা দাও, তাতেই খুসী, তাতেই আমার আনন্দ'। অনেক জ্ঞানী বা ভক্ত বাইরের দুঃখকেও এমনি করে তাঁর প্রসাদে বা আনন্দে রূপান্তরিত করেন। 'নিত্যাভিযুক্তের' যোগক্ষেম তিনি বহন করেন এইভাবে। নইলে প্রাকৃত দৃষ্টিতে আমরা দেখি, যে তাঁকে চায়, তারই দুর্দশা বেশী। লোকোক্তিতেও আছে, 'যে করে আমার আশ, করি তার সর্বনাশ। তবু না যদি ছাড়ে পাশ, হই তার দাসের দাস।' এমনি করে বাইরের সব-কিছু কেড়ে নিয়েও যে তিনি নিঃশেষে নিজেকে ঢেলে দেন আমাদের মধ্যে, এই হল যোগক্ষেম বহন করার সত্য তাৎপর্য। কথাটকে পাটোয়ারিবুদ্ধি দিয়ে বুঝলে চলবে না। 'তাঁকে যদি ডাকি, তাহলে আমার ছাওয়াল দুধে-ভাতে থাকবে'—তাঁর যোগক্ষেম বহন করার অর্থ এ নয়। কিন্তু আমরা প্রথমটায় এইরকমও বুঝি।

'অনন্য চিন্তা' হল শুধু তাঁকেই ভাবা, যিনি মনের ওপারে, যিনি বিজ্ঞানময়, আনন্দময়। দেহ-প্রাণ-মনের কোনও কামনাতেই তাঁকে না ভোলা।

সচ্চিদানন্দই পরমদেবতা। অন্য দেবতারা তাঁর বিভূতি। কেউ সোজাসুজি পরমকে চায়। কেউ অতটা পারে না—তাঁর কোনও বিভূতিকে আশ্রয় করে তাঁকে চায়। যেমন তুমি বিদ্যার দেবতা সরস্বতীকে চাইলে। সরস্বতীর উপাসনা তোমায় প্রজ্ঞানে পৌঁছে দেবে—এমন একটা ভাসা-ভাসা বোধ তোমার আছে। ওইটুকুই হল শ্রদ্ধা। কিন্তু কিভাবে যে পৌঁছে দেবে, তা তো তুমি বুঝতে পারছ না। তাই ছান্দোগ্যের নারদের মত বিদ্যার উপাসনা শুরু করলে। এই হল অবিধিপূর্বক যজন। কিন্তু তোমার শ্রদ্ধা যখন চিত্তকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তখন এই প্রমাদটুকুও কালে

থাকবে না। নারদের মতই তুমি বলে উঠবে, 'বিদ্যার উপাসনায় আমি মন্ত্রবিৎই হলাম, আত্মবিৎ হতে তো পারলাম না।' কিন্তু লক্ষ্য করো, সনৎকুমার তার জন্য নারদকে তিরস্কার করেননি। বলেছেন, 'বেশ তো, এই মন্ত্রশাস্ত্রকেই তুমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা কর না কেন?' তা করতে গিয়ে নারদের মনে প্রশ্ন জাগল, মন্ত্রশাস্ত্রই কি ব্রহ্মকে পাবার উপায়, তার চাইতে বড় কিছু নাই? সনৎকুমার বললেন, আছে। বলে ধাপে-ধাপে নারদকে ভূমায় পৌঁছে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে ছান্দোগ্যের এই কথাটাই আরেকভাবে বলছেন। শ্রদ্ধা যদি থাকে, তবে সব পথেই তাঁকে পাওয়া যায়। তবে কিনা পথের একটু অদল-বদল হয়। শ্রদ্ধাই ক্রমে ঘুর-পথ থেকে সোজা-পথে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন

'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্' (৯।২৫)—এই কথাকয়টির রহস্য কি? 'দেবব্রতা দেবান্' 'পিতৃব্রতাঃ পিতৄন্ যান্তি'; কিন্তু 'মদ্‌যাজী মাম্ যান্তি'—এই 'মাম্' কে?

উত্তর

শ্রদ্ধা আর ভক্তির সঙ্গে অন্য দেবতার যজনের কথা হচ্ছিল। তখন ভগবান বলেছিলেন, যারা তা করে, তারাও আমারই ভজনা করে—তবে কিনা করে অবিধিপূর্বক। এখানে তারই অনুবৃত্তি চলছে।

সব না দিলে যজ্ঞ হয় না। মীমাংসায় আছে, দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ। ত্যাগের সময় বলতে হয়, 'ইদং তব, ন মম'—এ তোমার, আমার নয়। এটি হল যজ্ঞের সামান্য বিধি।

দিচ্ছি, কিন্তু কি দিচ্ছি, আর কাকে দিচ্ছি—এবিষয়ে সম্যক্ বোধ থাকা চাই। নইলে যজ্ঞও সম্যক্ হবে না।

সব হয়তো দিলাম না, কিংবা যাকে দিলাম তাঁর স্বরূপজ্ঞান নাই। যজ্ঞেশ্বর সে-আহুতিও গ্রহণ করবেন—কিন্তু সে-যজ্ঞের ফল

হবে খণ্ডিত। তিনি তখন অপেক্ষা করেন। যজন-প্রবৃত্তি একবার যখন জন্মেছে, তখন স্বভাবের নিয়মেই ধীরে-ধীরে তা পুষ্ট হবে। একদিন যজমান তাঁকে চিনবে, আর তার সব-কিছু তাঁকে দেবে। এটা কালসাপেক্ষ।

'সব ছোড়ে, সব পাওরে।' সব দিলে তাঁকে পাব। কিন্তু পাওয়ারও ক্রম আছে। উপনিষৎ বলেন, প্রথম পাওয়া সালোক্য—তিনি যে-লোকে, যজমানও সেই লোকে অর্থাৎ একটা ব্যাপ্তি-চৈতন্যের ভূমিতে, এই প্রাকৃত জগৎ হতে আলাদা আরেকটা জগতে। সেখানকার বাসিন্দা হয়ে তাঁর মূর্ত বা অমূর্ত রূপের একাগ্র ভাবনায় ওই রূপ পাওয়া—এই হল পাওয়ার দ্বিতীয় পর্ব, যার নাম সারূপ্য। আরও নিবিড় করে পাওয়া মানে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া, এক হওয়া। তার নাম সাযুজ্য। পাওয়ার ওই হল তৃতীয় পর্ব।

এ-ও সাধারণ রীতি। সব দিলাম, কিন্তু কাকে দিলাম? সত্যি কি তাঁকে দিলাম? এই 'তিনি'টি কে এবং কি, তা আগেই বলা হয়েছে। এটি মানুষী তনুতে আশ্রিত ভূতমহেশ্বর একটি পরম ভাব (৯।১১)। অর্থাৎ তিনি একাধারে বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্বাত্মক এব 'গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ'। তাঁর এই তিনটি বিভাবকে একসঙ্গে জানা সহজ কথা নয়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে তাঁকে ভাবনা করা রূপাসক্ত মানুষের পক্ষে কিছুটা সহজ। কিন্তু রূপ যদি বিশ্বরূপে, আবার বিশ্বরূপ অরূপে উত্তীর্ণ না হয়, ভাবনা সংসিদ্ধ হবে না।

'ভূতেজ্যা' পাঞ্চভৌতিক দেহকে অবলম্বন করে পায়। কিন্তু দৈহ্য সংস্কার যদি একান্ত এবং প্রবল হয়, ভাবের বিকাশে বাধা ঘটে। তখন ওই ভূতকে অবলম্বন করে তাঁকে পাওয়া যায়—পাওয়া যায় ভূতের একটা মহিমময় রূপ। ভূতের আড়াল ভেঙে যাজ্ঞবল্ক্যের 'মহাভূত'কে ওতে পাওয়া যায় না। এটা হল পার্থিব লোকের সাধনা।

তার পরে আছে অন্তরিক্ষলোক বা পিতৃলোক। পিতৃব্রত হওয়াকে মোটামুটি বলা চলে 'প্রাণোপাসনা'। সে-উপাসনাও তাঁরই উপাসনা—কিন্তু তা-ও সম্যক্ নয়।

প্রাণলোক হতে যজমান উত্তীর্ণ হল দেবলোকে—হল 'দেবব্রত'। এটা খুব উঁচু অবস্থা। বৈদিক ঋষি বললেন, 'অবিদাম দেবান্'—আমরা বিশ্বদেবগণকে পেলাম। এখানে তাঁর বিশ্বরূপের সন্ধান পেতে পারি।

কিন্তু তারও পরে তাঁর পরম ধাম। ওই ঋষিই বললেন, 'অগন্ম জ্যোতিঃ'—আমরা জ্যোতিকে পেলাম। সেই পাওয়ার মধ্যেও আবার তুললেন 'জ্যোতিঃ—উত্তরজ্যোতিঃ—উত্তমজ্যোতিঃ'র কথা। এটা হল উজান ধারা।

এই উত্তম জ্যোতিকে যদি আবার 'কল্যাণতমরূপে' সংহত করা যায় এবং তার পটভূমিকায় স্থাপন করা যায় মহাশূন্যের পরঃকৃষ্ণ নীলিমাকে, তবেই তাঁকে পাওয়া যায় অরূপে কল্যাণতমরূপে বিশ্বরূপে এবং এই সাদা চোখে দেখা 'প্রতিচক্ষণীয়রূপে' বা 'প্রতিরূপে' (ঋ. ৬।৪৭।১৮)। এই দেখা এবং পাওয়া হল অপরূপ—তাঁর পাকা দেখা এবং পরম পাওয়া।

সব যজনের মধ্যেই এই পরম সাযুজ্যের লীলা লুকানো আছে। এইটুকুই ভরসার কথা। আর ভগবান সেই ভরসাই দিচ্ছেন।

কোনও মহাভাগ্যবান তাঁর প্রসাদে প্রথম দর্শনেই তাঁকে সব আড়াল ঘুচিয়ে এমনি করে দেখতে এবং পেতেও পারে।

প্রশ্ন

'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্' (৯।৩০)। দুরাচার ব্যক্তি কি অনন্যভাক্ হইয়া ভগবদ্ভজন করিতে পারে?

উত্তর

'অপি চেৎ' কথাটি লক্ষ্য করো—'যদি সে সুদুরাচারও হয়'। এর পরেও বলছেন, 'যারা পুণ্যাচার এবং ভক্ত ব্রাহ্মণ বা রাজর্ষি

তাদের তো কথাই নাই' (৯।৩৩)। শুদ্ধাচার হলে তবে ভক্তির উন্মেষ হবে—এটা হল কার্যকারণের কথা। তখনকার ভজন বিধি-মার্গে। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে রয়েছে রাগমার্গ। 'তাঁকে ভালবাসি, কেন ভালবাসি জানি না।' এ-ভালবাসার কোনও হেতু নাই। এই অহৈতুকী ভক্তির বীজ সব জীবের মধ্যে আছে। ওইটি তাঁর প্রসাদ। উপনিষদ্ তাই বললেন, 'তাঁকে প্রবচন মেধা বা বহুশ্রুতির দ্বারা পাওয়া যায় না। তিনি যাকে বরণ করেন, সেই তাঁকে পায়।' কাকে যে কখন বরণ করবেন, কেউ তা বলতে পারে না। যাকে তিনি চান, সেই তাঁকে চায়। আমরা অহংকার করে বলি, 'আমি এত করে তোমায় চাইছি, তবুও তুমি আমার পানে ফিরেও চাও না।' বুঝি না যে তাঁর প্রসাদেই তাঁকে চাইতে পারছি।

'আর কাউকে চাই না, চাই কেবল তোমাকেই'—এর নাম হল অনন্যভাক্ হয়ে তাঁকে চাওয়া। এমন অনন্যা ভক্তি সাধনের ফলে যেমন আসতে পারে, তেমনি অসাধনেও আসতে পারে। জ্ঞান বল, ভক্তি বল—সবটাই শেষপর্যন্ত বিদ্যুতের উন্মেষের মত হৃদয়ে তাঁর স্ফুরণ অথবা স্বভাবের স্ফুরণ।

হতে পারে, সাধনার ফলে এই স্ফুরণ হল। আবার এমনও হতে পারে, এই স্ফুরণ হওয়ার পর সাধনা শুরু হল। বিদ্যুৎ-ঝলকের মতই তিনি দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেলেন—কিন্তু আমি আর তাঁকে ভুলতে পারলাম না। তখন 'দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না'। তাঁকে চাই-ই চাই। এই হল এবার আমার 'সম্যক্ ব্যবসায়' কি-না একাগ্র এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (২।৪১), যা ডালে-ডালে ঘুরে বেড়ায় না। তিনি তখন বলবেন, 'হ'ক না ও দুরাচার, ও যখন আমাকে ছাড়া আর কাউকে চায় না, তখন জেনো ও সাধু। দেখো, ও দেখতে-দেখতে ধর্মাত্মা হয়ে উঠবে, শাশ্বতী শান্তিতে ও তলিয়ে যাবে (৯।৩০-৩১)।'

এটা বুদ্ধির ব্যাপার নয়—হৃদয়ের ব্যাপার। বুদ্ধি বড় সাবধানী, সে পদে-পদে বিচার করে চলে। আর হৃদয় যেন অজানার টানে ভেসে চলে। সে নিজেকে দেখে না—দেখে তাঁকে। আর এ-দেখাও তার নিজের কোনও কৃতিত্ব নয়, তাঁরই অহৈতুকী কৃপা। জগাই-মাধাইর কি করে গোত্রান্তর হল, তা বুদ্ধির অগোচর।

প্রশ্ন

'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' (৯।৩১)—ভক্ত-সত্তা বা ভক্ত-তত্ত্ব অবিনাশী ভগবৎ-তত্ত্বেরই ন্যত? ভগবানের এই বাণীতে তো দ্বৈত-সত্তাই স্বীকৃত—অর্থাৎ ভগবৎ-তত্ত্ব এবং ভক্ত-তত্ত্ব। উভয়ই তো অবিনাশী? তাহা হইলে অদ্বৈত সত্য হয় কেমন করিয়া?

উত্তর

'প্র-ণশ্' ধাতুর অর্থ হচ্ছে 'অদর্শন হওয়া, চোখের আড়াল হওয়া'। একথা ভগবান আগেও বলেছেন, 'যে আমাকে সবজায়গায় দেখে আর সব-কিছু আমাতে দেখে, তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি' (৬।৩০)। এখানেও এ-অর্থ খাটে। 'আমাকে ছাড়া সে কিছু চায় না বলে আমিও তাকে চোখে-চোখে রাখি, তার সব ভার আমি নিই।' 'ভক্ত অবিনাশী'—এ অর্থও হয়। কিন্তু ভগবানের কথায় এখানে ভালবাসার মধু ঝরে পড়ছে।

ভক্তি সম্বন্ধ-তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। দ্বৈত না হলে কে কাকে ভক্তি করবে? আর দ্বৈত স্বীকার করতেই-বা বাধা কোথায়? সবই যদি তিনি হন, তাহলে দ্বৈতও তাঁরই মধ্যে নিমজ্জিত বিগলিত হয়ে যায়। আমরা অদ্বৈত বলতে সাধারণত সংখ্যাদ্বৈত বুঝি। ওটা মনোরাজ্যের কথা—বিজ্ঞানের অনুভব নয়। 'অ-দ্বৈত' কথাটাই যে দ্বৈতবাসিত। 'অ-দ্বৈত' কি-না 'দ্বৈত নাই যেখানে'। তাতেও তো দ্বৈতের সত্তা স্বীকৃত হচ্ছে। শুধু এইটুকু বলা হচ্ছে, অনুভবের এই

ভূমিতে আর দ্বৈতকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু দ্বৈত তো তাতে একান্ত অসৎ হয়ে যাচ্ছে না।

দ্বৈতবোধকে আশ্রয় করে ব্যবহার চলে। ব্যবহারের মধ্যে প্রমাদের অবকাশ আছে। তাই দ্বৈতকে ছাপিয়ে অদ্বৈতের সাধনা। কিন্তু দিব্য ব্যবহার বা লীলাকে কি বলব? সেখানে তো প্রমাদের অবকাশ নাই। সেখানে যে-বিপর্যয়, তা ক্লিষ্ট নয়—অক্লিষ্ট বিপর্যয়।

দু'রকম অদ্বৈত-বুদ্ধি হতে পারে। একটি হল নেতিবাদের ফল—সিঁড়ি বেয়ে যখন ছাতে উঠছি আর প্রত্যেক সিঁড়িতে পা দিয়ে বলছি, এ ছাত নয়! বলে সিঁড়িটাকে বর্জন করছি। ছাতে গিয়ে দেখলাম, ও তো ইট-চুন-সুরকি। তখন নামতে-নামতে দেখছি, সবই ইট-চুন-সুরকি। এ-দেখাও অদ্বৈত কিনা ছাতে-সিঁড়িতে বা সিঁড়িতে-সিঁড়িতে এখানে কোনও ভেদ নাই। একটা হল সব বাদ দিয়ে অদ্বৈত, আরেকটা সব নিয়ে অদ্বৈত। একটার মহাবাক্য হল 'নেতি নেতি', আরেকটার 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। দ্বৈতকে বা বহুত্বকে তখন নিরাকৃত করবার দরকার হয় না।

ভক্ত ভগবানেরই একটা ঢেউ। ওতে অদ্বৈত-ভঙ্গই-বা হল কোথায়?

প্রশ্ন

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' (৯।৩৪)—গীতার এই শ্লোকের প্রত্যেকটি কথার রহস্য বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর

ভগবান বললেন, 'এমনি করে নিজেকে আমার সঙ্গে যুক্ত করে যদি মৎপরায়ণ হও, তাহলে আমাকেই পাবে' (৯।৩৪)। এখন কি করে তৎপর যোগী হওয়া যায়, তার সঙ্কেত রয়েছে শ্লোকের পূর্বার্ধে।

আমাদের মধ্যে তিনটি বৃত্তি প্রধান—মনন, ভজন এবং যজন। মন মনন করে, হৃদয় ভজন করে, আর সঙ্কল্প যজন করে। ওই থেকে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ আর কর্মযোগ। মানুষ মননধর্মী। সে-মন যদি অন্তর্মুখ হয়, হয়ে নিরন্তর আত্মার বা পরমাত্মার মনন করে, তাহলে মানুষ জ্ঞানী হয়। জ্ঞানের সাধনায় আনন্দ আছে। এই আনন্দই সম্বন্ধতত্ত্বের ভিতর দিয়ে পরিণত হয় ভক্তিতে। সোজা-কথায় যাঁকে আমার আত্মীয় বলে জানি, তাঁকে ভাল না বেসে পারি না। এই হল জ্ঞানী-ভক্তের লক্ষণ। এটি আবার উজ্জ্বল রস—অন্তরের একটি পরম আস্বদনীয় অনুভব। এই অনুভব বহির্ব্যক্ত হয় কর্মে বা ব্যবহারে। এই কর্মই যজ্ঞ। সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ কিনা তাঁর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্মের পরম্পরা। সে-কর্মের আমি কর্তা নই, ফলভোগীও নই। তিনিই কর্তা, আর যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তাও তিনিই (৫।২৯)। এই ভাবনায় যখন ভিতরটা একেবারে শূন্য হয়ে যায়, তখন অন্তরে ভূমার আবেশ হয়। আর তাইতে তাঁর কাছে সব লুটিয়ে দিয়ে বলতে পারি, আমি তোমারই আর কারও নই। এমনি করে অনন্যভাক্ হয়ে সর্ব কর্মে তাঁর মধ্যে নিজেকে লুটিয়ে দেওয়াই হল তাঁকে নমস্কার। নমস্কার হল প্রপত্তি এবং আত্ম-নিবেদনের বহিঃপ্রকাশ। পাহাড়ের গা বেয়ে বৃষ্টিজল গড়িয়ে পড়ে, এসে সঞ্চিত হয় পাহাড়তলীর হ্রদে। ওই হ্রদের মত তাঁর প্রসাদকে অহরহ ধারণা করতে পারাই যজ্ঞশিষ্ট অমৃতভোজন।

প্রশ্ন

দশম অধ্যায়ের নাম বিভূতিযোগ। ভগবানের এই বিভূতি এবং যোগকে যিনি 'তত্ত্বতঃ' জানেন, তিনি 'যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ' (১০।৭)। বিভূতি এবং যোগ এই দুইটি পৃথক্ করিয়া বলার উদ্দেশ্য কি? অবিকম্প যোগই বা কাহাকে বলে?

উত্তর

বিভূতিযোগ বিশ্বরূপদর্শনযোগের ভূমিকা। এখানে যে-অনুভব ভাবময়, বিশ্বরূপদর্শনে তা বাস্তব। ভগবান বিশ্বাতীত, বিশ্বরূপ এবং চিদ্‌ঘনবিগ্রহ—এই তিনরূপেই তাঁকে জানতে হবে, একথা আগে বলা হয়েছে। তিনটি ভাব ওতপ্রোত। তার মধ্যে 'অজ পরব্রহ্ম পরমধাম'রূপে তিনি বিশ্বাতীত, 'বিভু'রূপে বিশ্বাত্মক এবং তখনই তাঁর বিভূতির বিস্তার, আর 'শাশ্বত দিব্য পুরুষ'রূপে তিনি চিদ্‌ঘনবিগ্রহ—অর্জুন ঋষিদের জবানিতে মোটামুটি এইটুকু জানতেন (১০।১২-১৩)। এখন তাঁর বিভুরূপটি জানবার আগ্রহ ভগবানেরই হিতৈষণায় (১০।১)।

মূলকথা হল, যিনি এক তিনিই বহু হয়েছেন, ব্রহ্মই জগৎ হয়েছেন, বেদের ভাষায় 'ইন্দ্রই আত্মমায়ায় রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন'। তাঁর বহুরূপ বা বিশ্বরূপ একদিক দিয়ে যেমন তাঁর আত্মশক্তির বিচ্ছুরণ, তেমনি আরেকদিক দিয়ে তাঁর স্বরূপের আবরণও বটে। আমরা সাদাচোখে বিশ্বের বিচিত্র রূপ দেখি, কিন্তু এ যে তাঁরই রূপ—তা জানি না বা বুঝি না। তা জানতে হলে রূপের পিছনে উজিয়ে গিয়ে অরূপকে ধরতে হয়। এই উজান-বেয়ে চলাটা হল 'যোগ'। যেমন আমাদের যোগ, তেমনি তাঁরও যোগ অর্থাৎ 'ঐশ্বরযোগ' (৯।৫, ১১।৮)। এই যোগ তাঁর 'স্বরূপে অবস্থান'—বেদের ভাষায় 'স্বধা' কিনা আপনাতে আপনি থাকা। তখন তিনি 'কেবল'। কিন্তু যেমন তাঁর কৈবল্য আছে, তেমনি বিভূতিও আছে। বিভূতি হতে উজিয়ে যেতে হবে কৈবল্যের দিকে, আবার কৈবল্য হতে ভাটিয়ে আসতে হবে বিভূতির দিকে—আরোহ- আর অবরোহ-ক্রমে যোগের এই দুটি ধারা। এই দুটি ধারায় তাঁকে জানতে পারলে যোগ অবিকম্প হয় কিনা সুস্থির হয়। যোগী তখন সমাধিতে এবং ব্যুত্থানে নিত্যযুক্ত, কোনও অবস্থাতেই তিনি যোগভ্রষ্ট হন না।

অবশ্য এটি প্রথমেই হয় না। প্রাকৃত অবস্থায় যখন জগৎ দেখি বা তাঁর বিভূতি দেখি, তখন তাঁকে দেখি না। এটি অযোগের অবস্থা। তারপর জগৎ হতে উজিয়ে গিয়ে যখন তাঁকে দেখি, তখন আবার জগৎ দেখি না। সেখান থেকে নেমে এলে আবার তাঁকে দেখি না, তাঁর সঙ্গে যে-যোগ ঘটেছিল, তা যেন টলে যায়। কিন্তু তখনও একটা সংস্কার থাকে। বারবার উঠা-নামা করতে-করতে যখন সমাধিতে-ব্যুত্থানে জাগ্রতে-নিদ্রায়, ভিতরে-বাইরে সর্বাবস্থায় তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকা যায়, তখনই যোগ অবিকম্প হয়। আর তাইতে 'তত্ত্বত' তাঁর জ্ঞান হয় অর্থাৎ তিনি যে কি তা ঠিক-ঠিক আমরা বুঝতে পারি।

প্রশ্ন

মচ্চিত্ত, মদ্‌গতপ্রাণ, সততযুক্ত—পরিভাষা-কয়টির রহস্য কি? ভগবানের চিত্তকে ধরিবই-বা কি প্রকারে? ধ্যানই-বা করিব কিভাবে? 'দদামি বুদ্ধি-যোগং'—সকলকেই কি নির্বিচারে ভগবান্ বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন (১০।৯-১১)?

উত্তর

'ভাবসমন্বিত বুধ'দের (১০।৮) কথা হচ্ছে। এঁরা বিশিষ্ট ভক্ত। ভক্তি কিছু-না-কিছু সবার মধ্যেই আছে, কেননা জীবলোকে জীব মাত্রেই ভগবানের সনাতন অংশ (১৫।৭) এবং তাঁর পরা প্রকৃতি (৭।৫)। ভগবান অন্যত্র চতুর্বিধ ভক্তের কথা বলেছেন (৭।১৬)। এও বলেছেন, তারা সবাই উদার, তবে কি-না তাদের মধ্যে একভক্তি জ্ঞানী-ভক্তই বিশিষ্ট; তিনি নিত্যযুক্ত, ভগবানের আত্মস্বরূপ, 'বাসুদেবই সব' এই জ্ঞান তাঁতে নিত্যজাগ্রত (৭।১৭-১৯)। ভক্তির এই চরম পরিণামটি এখানকার পটভূমিকা। বিভূতিযোগেরও শেষ কথা—বাসুদেবই সব।

আবার এটি ভাবের কথা। ভজনের ফলে ভাবের উদয়, ভাব হতে 'বোধ'। ভাবের আশ্রয় হল চিত্ত। বলা যেতে পারে, ভাব চিত্তের সাত্ত্বিক প্রক্ষোভ—যাতে মন তাঁর প্রতি একরস হয়। তাঁর 'ভাবনায়' (তু. ২।৬৬) চিত্তে আলোর তরঙ্গ উঠছে, তিনি ছাড়া 'আন নাহি ভায়'—এই হল 'তচ্চিত্ত' হওয়া। এটি গোপীচিত্তের ধর্ম।

প্রাচীন পরিভাষা অনুসারে 'চিত্ত' মনের উর্ধ্বে, মন তার বৃত্তিময় অবস্থা। গীতায় অন্যত্র তাকে বলা হয়েছে 'চেতনা' বা consciousness-stuff (১০।২২, ১৩।৬)। সমস্ত চেতনা যখন তাঁর ভাবনার দ্বারা জারিত, তখন আমরা 'তচ্চিত্ত'।

চিত্ত আর মনের নীচে হল প্রাণ। তার ক্রিয়া প্রকাশ পায় ইন্দ্রিয়-মনের বৃত্তিতে। শুধু তচ্চিত্ত হওয়া নয়, তদ্গতপ্রাণ হওয়া চাই। তাঁর ভাবনায় আবিষ্ট থেকে ব্যবহারের ভূমিতে নেমে আসতে হবে। ব্যবহারেও তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। গীতার যোগ শুধু সমাধিতেই নয়—ব্যুত্থানেও। তবে তা 'অবিকম্প যোগ' হয় (১০।৭)।

চিত্তে এবং প্রাণে তাঁর আবেশ যে দেহেও সংক্রামিত হয়—একথা বলাই বাহুল্য। বেদে একে বলা হয়েছে 'ব্রহ্মবর্চঃ' বা ব্রহ্মের আবেশজনিত দীপ্তি।

দেহে প্রাণে চিত্তে যিনি তন্ময়, তিনিই 'ভাবসমন্বিত বুধ'। 'বুধ' 'বোধ' 'বুদ্ধি'—এই শব্দগুলি পারিভাষিক। আসলে তিনিই 'বুধ' বা বুদ্ধ, যিনি ভোরের পাখির মত তাঁর আলোয় জেগে উঠেছেন। এ-আলো যে তিনিই হৃদয়ে জ্বালিয়ে তোলেন, একথা এই প্রসঙ্গের শেষেই আছে—তিনি অনুকম্পা করে আত্মভাবে স্থিত হয়ে ভাস্বর জ্ঞানদীপ দিয়ে অজ্ঞানজ তম নাশ করেন 'ভাবসমন্বিত' বুদ্ধ ভক্তের (১০।১১)। ভজনের ফলে ভাবোদয়, তার ফলে বোধোদয়—এই ক্রমটি লক্ষণীয়।

বুদ্ধ ভক্ত যখন ব্যবহারের জগতে নেমে আসেন, তখন তিনি দেখেন তাঁর চারদিকে এক আলোর জগৎ, এক প্রেমের জগৎ। তার কেন্দ্রে তাঁর দেবতা। তাঁর আলোই আমাদের 'বুদ্ধি' বা বোধি, তাঁর আনন্দই আমাদের 'তুষ্টি' এবং 'রতি'। হৃদয়ে-হৃদয়ে তাঁর আপনহাতে জ্বালা জ্ঞানের দীপ। এক হৃদয়ের আলো আরেক হৃদয়ে পড়ে তাকে আরও উজ্জ্বল আরও মধুর করে তুলছে। সে-জগতে তাঁর কথা ছাড়া কথা নাই, তাঁর কর্ম ছাড়া কর্ম নাই। সততযুক্ত হয়ে তাঁকে ভালবাসা ছাড়া আর কোনও রস নাই। এই-জগতেরই কল্পছবি ভাগবতের গোষ্ঠে এবং রাসে।

এমনি করে যে তাঁর 'উপযান' কি-না তাঁর কাছে যাওয়া, তাঁকে নিবিড় করে কাছে পাওয়া (১০।১০), তার মূলে আছে তাঁরই প্রসাদ বা অনুকম্পা (১০।১১)। আমাদের যা-কিছু ভাব অথবা অভাব, সব তাঁরই দান (১০।৪-৫)। তাঁর শ্রেষ্ঠ দান বুদ্ধিযোগ যা অভাব ও ভাবের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে আমাদের উত্তীর্ণ করে 'আত্মভাবে' (১০।১১) এবং তাহতে তাঁর ভাবে বা মহাভাবে (১০।৮)। এই ভাবের অঞ্জন চোখে মেখে দেখি, তিনিই সব—সব-কিছুর প্রভব এবং প্রবৃত্তি দুই-ই তিনি (১০।৮, তু. ১৮।৪৬, ১৫।৪)।

এই বোধই বুদ্ধিযোগ—হৃদয়ের ভাস্বর জ্ঞানদীপের আলোয় অন্তরে-বাইরে সর্বত্র তাঁকে দেখা। এই বোধোদয় যেন জীবনে নতুন করে সূর্যোদয়। বেদে একে বলা হয়েছে 'প্রতিবোধ'—যা দেবতার প্রসাদজ। এ-বুদ্ধিযোগ সর্বজনীন—জীবের দিব্য নিয়তি, একদিন না একদিন সবার মধ্যে ফুটবেই। এখন ভূতে-ভূতে তা গুহাহিত হয়ে আছে 'চেতনা' রূপে (১০।১২ ; তু. ১৩।৬)।

লক্ষণীয়, বুদ্ধির দুটি বিবৃতি আছে। একটি বুদ্ধি গুণময়ী, আরেকটি গুণের ঊর্ধ্বে। এই শেষেরটি বুদ্ধিযোগের বুদ্ধি।

প্রশ্ন

'কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া' (১০।১৭)। ভগবানের অবস্থিতির যে বিবরণ স্বয়ং তিনি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুধ্যানের উপায় বা প্রণালী সম্পর্কে কিছু বলিবেন কি? 'জপযজ্ঞ'—জপকে কেন যজ্ঞ বলা হইল (১০।২৫)?

উত্তর

যিনি এক, তিনিই বহু হয়েছেন। যখন তিনি এক, তখন তিনি স্বরূপে অবস্থিত। তখন তিনি 'যোগী'—তাই অর্জুনের সম্বোধন 'যোগিন্' (১০।১৭)। এইটি তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ পরম ভাব (৯।১১)। এই ভাব হতেই বিশ্বের বিসৃষ্টি—বহুরূপে। তখন তিনি 'বিভু' (১০।১২)। বিভুর বিভূতি এই 'বিশ্বা ভূতানি'। প্রত্যেক 'ভূতের' বীজসত্তায় তিনি 'ভাব'রূপে আবিষ্ট। ভূত আর ভাব—দুই নিয়ে 'বিসর্গ'—বেদের ভাষায় 'বিসৃষ্টি' (৮।৩)। উপনিষদে এই ভূত হল নাম এবং রূপে অব্যাকৃতের ব্যাকৃতি (ছা. ৬।৩।২) অর্থাৎ অব্যক্তের ব্যক্ত রূপ। এই অভিব্যক্তির মূলে যে 'দেবতার ঈক্ষা' যা 'জীব আত্মা'রূপে ভূতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাই হল 'ভাব' (ঐ)। মূলে এক ভাব, আর স্থূলে ভূতে-ভূতে পৃথক্‌বিধ ভাবের আবেশ (১০।৫)। উপনিষদের ভাষায় মূলে এক 'মহাভূত' (বৃ. ২।৪।১০), আর স্থূলে তাঁরই ভূতে-ভূতে বহুধা বিসৃষ্টি। আমাদের যেতে হবে স্থূল হতে মূলে, ভূত হতে ভাবে—চিন্তার মাধ্যমে।

ভাব এক, আবার বহু। বহু ভাব বিশ্বে, এক ভাব বিশ্বাতীতে। বিশ্ব আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধির গোচর। বিশ্বাতীতে যেতে হলে তাকে উঠতে হবে অপ্রাকৃত ভূমিতে। অপ্রাকৃত বুদ্ধি শুদ্ধবুদ্ধি, ভাস্বর জ্ঞানদীপের দ্বারা আলোকিত বুদ্ধি। সে সবকিছুর মধ্যে দেবতার আভাস পায়। জগৎটা তার দৃষ্টিতে নিছক অবিদ্যার খেলা নয়। অন্ধকার সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় ক্রমে আলো হয়ে উঠছে, 'জনানাং

হৃদি সন্নিবিষ্টঃ’ তিনিই ধীরে-ধীরে ফুটে উঠছেন—এই দিব্যদৃষ্টি তার সহগত। আর তা-ই বিভূতিযোগের মর্মকথাও।

চারদিকে যা-কিছু দেখছি, সবই তিনি। কিন্তু তিনি তো পটে আঁকা ছবির মত নিষ্প্রাণ নন। বেদ বলছেন, তিনি প্রাণস্বরূপ। আর এই প্রাণের লক্ষ্য, ভূতে-ভূতে চৈতন্যের ক্রমিক উন্মেষ ঘটানো। ঋগ্বেদের ঐতরেয়ারণ্যকে একথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই চিৎ-প্রকর্ষই হল তাঁর যোগবিভূতি। অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই কথাই বলেছেন (১০।৪১)।

কালোর মধ্যেও আলোর সম্ভাবনার অনুধ্যানই হল বিভূতি-যোগের সার্থক সাধনা। তখন সুদুরাচারের মধ্যেও আমরা সাধুত্বের বীজ দেখতে পেয়ে তারই আরতি করি—সাধকদশায় দুরাচারকে উপেক্ষা করে, এবং সিদ্ধদশায় তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার রূপান্তর ঘটিয়ে।

যজ্ঞ হল দেবতার সাযুজ্য লাভের সাধন। যেমন দ্রব্যযজ্ঞ আছে, তেমনি আবার আছে জ্ঞানযজ্ঞ (৪।২৮,৩৩)। জপ স্বাধ্যায়রূপে জ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্গত (৪।২৮)। বেদে এটি হল ‘উক্‌থ’ বা বাকের সাধনা। বেদে দেবতার ‘চারু নামের মননে’র কথা আছে—তা-ই হল বৈদিক জপ। সুতরাং জপের সাধনা অতি প্রাচীন এবং সার্বভৌম। ওঙ্কারজপ আবার সর্বজপের শ্রেষ্ঠ। বেদে এই ওঙ্কারকে বলা হয়েছে ‘একপদী বাক্’ কিনা সমস্ত বাক্ বা মন্ত্রের পর্যবসান। পতঞ্জলিও বলেছেন, প্রণব ঈশ্বরের বাচক এবং অর্থ-ভাবনাসহ তার জপে ঈশ্বরপ্রণিধান এবং তার ফলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। লক্ষণীয়, এখানে শব্দব্রহ্মের ‘জপ’ এবং পরব্রহ্মের ‘ভাবনা’ বা মনন—দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেই জপের বিধান আছে। তাই জপযজ্ঞ যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সর্বজনীনও বটে।

প্রশ্ন

'স্রোতসামস্মি জাহ্নবী' (১০।৩১)—নদীর মধ্যে ভগবান গঙ্গা নদী। জাহ্নবীর ধ্যান কি জলরাশির ধ্যান, না পতিতপাবনী জীবোদ্ধারিণী শক্তি বা ভাবের ধ্যান? গঙ্গাদেবীর বাহন মকরের কি নিগূঢ় রহস্য আছে?

উত্তর

জলরাশি আলম্বন মাত্র, বস্তুত ধ্যান দেবতারই হয়। ধ্যানের পরিপাকে দেবাবিষ্ট চেতনায় আবার সবই চিন্ময়—গঙ্গার বারি তখন 'ব্রহ্মবারি।' এমনি করে ধ্যানেরও আরোহ আর অবরোহ—দুটি ক্রম আছে।

নদী মা—এ-ভাবনা ঋক্‌সংহিতাতেই পাই। সেখানে দেবনদী সরস্বতীকে একনিঃশ্বাসে 'নদীতমা অম্বিতমা দেবিতমা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে (২।৪১।১৬)। সরস্বতীই বৈদিকদের আদি দেবনদী। পরে এই মর্যাদা পান গঙ্গা। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর একসঙ্গে উল্লেখ ঋক্‌সংহিতাতেই আছে (১০।৭৫।৫)। এইটি আমাদের সুপরিচিত ত্রিবেণী। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নদী যে নাড়ী, তার সূচনা বেদেই আছে। হঠযোগে গঙ্গা ইড়া, যমুনা পিঙ্গলা আর সরস্বতী মধ্যনাড়ী সুষুম্ণা। গঙ্গার আরেক নাম 'জাহ্নবী' বা জহ্নুকন্যা। ওই নামটিও ঋক্‌সংহিতায় পাই (১।১১৬।১৯, ৩।৫৮।৬)। অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে সম্পর্কহেতু বেদের 'জাহ্নবী' দ্যুলোকের আলোকধারার উৎসকে বোঝাচ্ছে, এটি স্বচ্ছন্দে বোঝা যায়। জাহ্নবীকে আমরা এখন বলি গঙ্গোত্রী।

সরস্বতী গিরিশিখর হতে সমুদ্রে নেমে এসে আবার গিরিশিখরের দিকে উজিয়ে যাচ্ছেন—এই ভাবনাটি বেদে আছে। পরে এটি উপচরিত হয়েছে গঙ্গাতেও। গঙ্গা যেখানে উত্তরবাহিনী অর্থাৎ গঙ্গোত্রীর দিকে উজিয়ে যাচ্ছেন, সেখানেই 'কাশী', কিনা, 'নিজবোধ-রূপা জ্ঞানপ্রবাহা চিৎশক্তির অধিষ্ঠান' (শঙ্কর)।

এইথেকে গঙ্গা অমৃতের আর যমুনা মৃত্যুর ধারা। ত্রিবেণীতে সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে গঙ্গা থাকেন বামে, আর যমুনা

দক্ষিণে। দক্ষিণায়নে আলোর অবক্ষয় সূচিত করে মৃত্যু, তেমনি উত্তরায়ণে তার উপচয় সূচিত করে অমৃত প্রাণ। অতএব গঙ্গা প্রাণের ধারা, যমুনা মৃত্যুর ধারা। বেদেও 'যমী' বা যমুনা মৃত্যুর সহোদরা—পুরাণে বিবস্বান্ বা সূর্যের কন্যা। অর্থাৎ প্রাকৃত মৃত্যুরও উৎস যোগীর বৈবস্বত মৃত্যু। প্রাণ ও মৃত্যুর মধ্যে প্রজ্ঞার গুপ্তধারা সরস্বতীরূপে প্রবাহিতা। এইটি ত্রিবেণীর তত্ত্ব, আর এই তত্ত্বের উপর ভারতবর্ষের 'তীর্থের' প্রতিষ্ঠা। তীর্থ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'পারঘাটা', বেদের ভাষায় সেখান থেকে শুরু হয় আয়ুর 'প্রতরণ' কিনা উজান বওয়া।

ত্রিবেণীতে প্রাকৃত মৃত্যুর ধারা লুপ্ত হল গঙ্গার অমৃতধারায়। জীবন ও মৃত্যু উভয়কে বহন করে জাহ্নবী সমুদ্রসঙ্গতা হলেন। এই তাঁর মহিমা। সমুদ্র হতে যদি তাঁকে উত্তরবাহিনীরূপে দেখি, তাঁর প্রতি তীর্থই 'জ্ঞানপ্রবাহা নিজবোধরূপা কাশিকা'।

জাহ্নবী তখন মকরবাহিনী। মকরের উল্লেখ যজুর্বেদে আছে। মকরসংক্রান্তিতে শুরু হয় সূর্যের উত্তরায়ণ, আলোর ক্রমিক উপচয়। বেদে একে বর্ণনা করা হয়েছে অন্ধতমিস্রা পার হয়ে জ্যোতি হতে উত্তরজ্যোতিতে এবং তা হতে উত্তমজ্যোতিতে চেতনার উত্তরণ (ঋ. ১৷৫০৷১০)।

ভারতবর্ষের মন্দিরশিল্পে বহুজায়গায় গঙ্গা আর যমুনার প্রতিমা মুখামুখি বসানো দেখা যায়। গঙ্গা যেমন মকরবাহিনী, যমুনা তেমনি কূর্মবাহিনী। কূর্ম প্রাণের সঙ্কোচের প্রতীক (তু. ২৷৫৮)। এই সঙ্কোচ নিদ্রা মৃত্যু অথবা সমাধির প্রবর্তক। সমাধিতে যোগীর মৃত্যু বৈবস্বত মৃত্যু। ওইটি যমুনোত্তরী—গঙ্গোত্রীর পাশেই। একটিতে পরিনির্বাণ, আরেকটিতে বিস্ফারণ বা বৃহত্তা, ব্রহ্মময়তা। সারস্বত ধারায় দুটিই সমভাবে বিধৃত।

প্রশ্ন

'গায়ত্রী ছন্দসামহম্' (১০।৩৫)—ভগবান্ ছন্দের মধ্যে গায়ত্রীকে কেন নির্বাচন করিলেন? গায়ত্রী ছন্দের বৈশিষ্ট্য কি? 'মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ' (১০।৩৭)—ব্যাস কি মুনি, না ঋষি?

উত্তর

গায়ত্রী বেদের সাতটি প্রধান ছন্দের আদিতে। গায়ত্রীতে অক্ষর-সংখ্যা চব্বিশ, তারপর ক্রমান্বয়ে চারটি করে অক্ষর বাড়িয়ে-বাড়িয়ে শেষপর্যন্ত পৌঁছন গেছে জগতীচ্ছন্দে। ঋক্‌সংহিতায় আছে, গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ, আর জগতী বিশ্বদেবগণের। অগ্নি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জীব-চৈতন্য। জীবচৈতন্য বৃহৎ হয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছে বিশ্বচৈতন্যে—এই ভাবনাটি আছে সপ্তচ্ছন্দের বিন্যাসের মূলে।

বেদে অগ্নি আর সোম যুগ্ম-দেবতা। সোম আনন্দের দেবতা। বিশ্বময় নিজেকে বিস্ফারিত করে সহজানন্দে উল্লসিত হওরাই সোমযাগের তাৎপর্য। চিদগ্নির উদ্দীপনে তা সম্ভব হয়। অগ্নি এবং তাঁর ছন্দ গায়ত্রীর উপাসনার গুরুত্ব এইখানে। গায়ত্রী দ্যুলোক হতে কুমারী মেয়ে হয়ে সোমকে নামিয়ে এনেছিলেন পৃথিবীতে—বেদের ব্রাহ্মণে এই কাহিনী প্রসিদ্ধ। গায়ত্রী তাই কুমারীতত্ত্বেরও আধার।

সাধন-পন্থার দিক দিয়ে মুনি আর ঋষিতে তফাত আছে। ঋক্‌সংহিতায় একটি পথকে বলা হয়েছে 'মৌনেয়', আরেকটিকে 'আর্ষেয়'। কিন্তু সিদ্ধদশায় দুটি এক হয়ে যায়। বেদে উপনিষদে সর্বত্র তারা ওতপ্রোত। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই মহাবাক্য সেই সমন্বয়ের বাচক। সুতরাং যিনি ঋষি, তাঁর মুনি হতে কোনও বাধা নাই। এই বিভূতিযোগেই সিদ্ধ কপিলকে বিশেষ করে বলা হয়েছে মুনি (১০।২৬)। আবার কপিল 'ঋষি'র উল্লেখও পাই। বেদান্তীদের মতে এই কপিল ঋষি হিরণ্যগর্ভ। সাংখ্যাচার্যদের মতে কপিলই হিরণ্যগর্ভরূপে বিশ্বের আদিগুরু। ভাবের দিক দিয়ে দুটি উক্তিতে কোনও বিরোধ নাই।

সাংখ্য মুনিদের দর্শন, আর বেদান্ত ঋষিদের। ব্যাসের পুরাণ-গুলিতে দুয়ের সমন্বয় আছে—যার মূল উপনিষদে। সুতরাং ব্যাসকে আমরা মুনি এবং ঋষি দুই-ই বলতে পারি।

প্রশ্ন

'বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ, উর্জিতম্ এব বা' (১০।৪১)—পরিভাষাকয়টির বিশ্লেষণ করিলে ভাল হয়। 'সর্বভূতানাং বীজং' (১০।৩৯) বলিতে কি বুঝিব? বীজের রহস্যার্থ কি? চতুষ্পাৎ ব্রহ্মের একাংশ জগৎ, বাকী তিন অংশের আভাস বা মর্মরহস্য বিশ্লেষণ করিবেন কি? জগদতীত রূপ ধারণায় আনিবার প্রণালী বা উপায় কি?

উত্তর

যিনি 'মহান্', 'অণু'তে তাঁর গুটিয়ে আসাই হল বীজভাব। বীজ সপ্রাণ, তা অঙ্কুরিত পল্লবিত পুষ্পিত ফলিত হয়। এই ব্যাপারটি বীজের 'বিভাবনা' বা বিভূতিমৎ হওয়া। যা সপ্রাণ, তা অবশ্যই সচিৎ—কেননা প্রাণ আর চেতনা অবিনাভূত, চিৎশক্তির উন্মেষ-নিমেষেই প্রাণের পরিচয়। সর্বভূতের বীজ হল তার অন্তর্নিহিত চিৎশক্তির স্ফুরত্তা (dynamis)। ছান্দোগ্যোপনিষদে ভূতবীজের প্রসঙ্গ আছে (৬।৩।১-৩)। তার কথা আগেই বলেছি।

ভগবানের 'বিভূতি' হল তাঁর বহু হওয়া। ঋক্‌সংহিতাতে পাই, 'একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্'—সেই একই বিচিত্র হয়ে হলেন এই যা-কিছু সব (৮।৫৮।২)। তাঁর এই বিভাবনার মধ্যে যদি কোথাও বিশিষ্ট কোনও শক্তির প্রকাশ হয়, তাকে 'বিভূতি' বলা হয়। 'বি' উপসর্গের অর্থ তাহলে 'বিচিত্র' এবং 'বিশিষ্ট' দুই-ই। শক্তির বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটে আবরণভঙ্গের ফলে। বাধা না থাকলে শক্তির প্রকাশ হয় না। বাধাকে ভাঙতে যে-বল প্রয়োগ করা হয়, বেদে তার পারিভাষিক সংজ্ঞা হল 'উর্জ্' কি না মোড় ঘুরিয়ে

দেবার সামর্থ্য এবং বীর্য। অপরা প্রকৃতির মোড় ঘুরিয়ে তাকে পরা প্রকৃতির উন্মেষের অনুকূল করা হল 'উর্জ্'। 'বিভূতি' উর্জিত হলেই প্রকাশ পায় 'শ্রী' বা সর্বতোভদ্র সৌষম্য। বৈষ্ণবের কাছে 'শ্রী' বিষ্ণুশক্তি। তান্ত্রিকের 'শ্রী' পরমা শক্তির বিদ্যা। শ্রী—ষোড়শী, ত্রিপুরসুন্দরী, ব্রহ্মের আনন্দ-লহরী। ব্রহ্মের বিভাবনার পরম পর্যবসান 'শ্রী'তে।

ঋক্‌সংহিতায় আছে, 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'—বিশ্বভূত হল এই পুরুষের একপাদ, আর এর বাকী তিনপাদ দ্যুলোকে অমৃত হয়ে আছে (১০।৯০।৩)। বিশ্বভূত মৃত্যুস্পৃষ্ট, তা তাঁর একপাদ মাত্র। একে আমরা বলি স্থূলজগৎ—যেখানে অনবরত ভাঙা-গড়ার কাজ চলছে। এই ভাঙা-গড়ার লক্ষ্য হচ্ছে 'ভূতে'র মধ্যে 'ভাব'কে পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা। ভূত তাই মৃত্যুলাঞ্ছিত, আর ভাব অমৃত। এই 'ভাব' হল পুরুষের দ্বিতীয় পাদ। যেমন বিচিত্র ভূত, তেমনি বিচিত্র ভাব। বিচিত্র ভাব সংহত হয়েছে এক 'শক্তি'তে। এই শক্তি হল পুরুষের তৃতীয় পাদ—তাও অমৃত। চতুর্থ পাদ শক্তিমান 'পুরুষ' স্বয়ং—যাঁর মধ্যে শক্তির উন্মেষ-নিমেষ ঘটছে। উন্মেষ-নিমেষে কিন্তু শক্তির অনিত্যতা সূচিত হয় না, কেননা উন্মেষের মত নিমেষও শক্তিরই ক্রিয়া। শিব যখন প্রপঞ্চে উল্লসিত, তখন তিনি যেমন শক্তিমান, তেমনি প্রপঞ্চোপশমে শক্তির নিমেষেও শক্তিমান। এই চারটি পাদকে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এবং মহাকারণও বলা হয়।

অন্তর্মুখ হয়ে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে এবং তাহতে কারণে যাওয়া এবং অবশেষে মহাকারণরূপে কারণেরও সাক্ষী হওয়া হল পুরুষের বিশ্বাতীত পরমভাবের ধারণার উপায়।

প্রশ্ন

মহাযোগেশ্বর হরি অর্জুনকে তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। যোগৈশ্বর্য বা বিভূতি শব্দের অর্থ কি? কেবল যোগেশ্বর না বলিয়া মহাযোগেশ্বর বলার তাৎপর্য কি? দিব্যচক্ষু কাহাকে বলে? স্বচক্ষুর দ্বারা ঐশ্বরীয় রূপ দর্শন করা যায় না কেন? দিব্যচক্ষু বলিতে কি অন্য এক প্রকার চক্ষুকে বোঝায়? না, এই চোখেরই অন্য প্রকার দৃষ্টিশক্তি খুলিয়া যায়? আত্মচেষ্টা দ্বারা ঐশ্বরীয় রূপ সন্দর্শন করা যায় না, থাকা চাই পরমেশ্বরের অনুগ্রহ। অনুগ্রহের কি যোগ্যাযোগ্য পাত্রাপাত্র বিচার নাই (১১।৪,৮,৯)?

উত্তর

'বি-ভূতি' বেদের একটা পারিভাষিক সংজ্ঞা—'একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্'—সেই একই এই বিচিত্র সব-কিছু হয়েছেন। একের বহু হওয়া বিভূতি। 'পুরুষ এব ইদং সর্বম্'—সেই পুরুষই এই সব-কিছু। 'বিভূতি'র সঙ্গে অন্বিত আরেকটি সংজ্ঞা বেদে আছে—'সম্ভূতি'। অম্ভৃণকন্যা বাক্ নিজের বিশ্বপরিণামকে 'সম্ভূতি' বলেছেন। ঈশোপনিষদে আছে অসম্ভূতির কথা, যা সম্ভূতিরও ঊর্ধ্বে। একটি উপমা দিয়ে তিনটি সংজ্ঞার অন্যোন্যসম্বন্ধ বোঝানো যেতে পারে। 'অসম্ভূতি' যেন অবর্ণ আকাশ, 'সম্ভূতি' সেই আকাশে সূর্যমণ্ডল, আর 'বিভূতি' পরিকীর্ণ সূর্যরশ্মি। বিশ্বে যে বহুর মেলা, তা একের বিভূতি। এই বহু বিধৃত রয়েছে যে-মহাশক্তিতে বা মহদ্‌ব্রহ্মরূপ যোনিতে (১৪।৪), তা-ই সম্ভূতি, আর অসম্ভূতি সেই শক্তিরও আশ্রয় পরমচৈতন্য।

'বিভূতি' সংজ্ঞাটি যোগেরও একটি পরিভাষা। তার আরেক নাম 'সিদ্ধি'—চলতি কথায় বলা হয় 'সিদ্ধাই'। বিক্ষিপ্ত চৈতন্যকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে এনে কৈবল্যের দিকে উজান বইয়ে দিলে প্রকৃতির নিয়মেই শক্তির অলৌকিক স্ফুরণ হয়, তাকে যোগবিভূতি বলা হয়। গীতোক্ত বিভূতিতে এই ব্যঞ্জনাও আছে।

তবে কিনা ভগবান্ নিত্য যোগযুক্ত—তাঁর সম্ভূতি এবং বিভূতিতেও অসম্ভূতির আবেশ রয়েছে। তাই তাঁর বিভূতি বা সিদ্ধি ঠিক 'উপসর্গ' নয়—'বিসর্গ' (৮।৩) বা 'বিসৃষ্টি'। এই বিসৃষ্টিতে তিনি সব-কিছুর মধ্যে পূর্ণমাত্রাতেই অধিষ্ঠিত থাকেন—তাঁরই ভাষায় 'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' (১৫।১৫ ; তু. ১৮।৬১)। এইটি 'ঐশ্বর যোগ' বা মহাযোগের বিশিষ্ট লক্ষণ। সাধক যোগীর মধ্যে যখন বিভূতির স্ফুরণ হয়, তখন তাঁর এই মহিমা থাকে না—সিদ্ধযোগীর থাকতে পারে বটে। কিন্তু তাঁর বেলাতেও মহিমা সঙ্কুচিত, কেননা সিদ্ধদশায় ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ভোগসাম্যই হতে পারে—শক্তিসাম্য হয় না। ঈশ্বরের যোগের প্রকাশ যেমন প্রপঞ্চোপশমে, তেমনি প্রপঞ্চোল্লাসে। যোগেশ্বরের যোগবিভূতি প্রপঞ্চের একদেশে আংশিক মহিমার স্ফুরণে, ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সাম্য 'জগদ্ব্যাপারবর্জম্'। তাই তিনি 'মহাযোগেশ্বর' নন।

দিব্যচক্ষুর আরেক নাম 'প্রজ্ঞাচক্ষুঃ'। সাধারণ চক্ষু ইন্দ্রিয় মাত্র—তাকে বলে 'মাংসচক্ষু'। এই চক্ষুর শক্তি সীমিত। যন্ত্র-সহায়ে তার শক্তি বাড়ালেও দর্শনের যে মূল ন্যূনতা, তা কিন্তু থেকেই যায়। অর্থাৎ তা স্থূলের দর্শন, লৌকিক দর্শন, বস্তুর দর্শন—শক্তি ভাব বা চৈতন্যের দর্শন নয়। দিব্যচক্ষুর দর্শন মূলত 'বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়' (৬।২১) দর্শন, অথচ তা যে চোখ বুজে দেখা তা-ও নয়। অর্জুন বিশ্বরূপ দেখেছিলেন ভাবের ঘোরে নয়—এই সাদা চোখের দেখাতেই ঐশ্বরভাবের আবেশে তাঁর সামর্থ্য এবং প্রকারের আমূল রূপান্তর ঘটেছিল। এ হল বেদের চিন্ময়প্রত্যক্ষ। এটি উপর থেকে শক্তিপাত না হলে হয় না। এমন করে দেখবার যোগ্যতা সব আধারের নাই। অর্জুন তা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বলছেন, 'মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুম্' (১১।৪)। সাদাচোখে 'ঐশ্বররূপ' (১১।৩) দেখতে হলে আগে ওই চোখদুটিকে কানা করে দিতে হবে। তারই নাম বৃত্তিনিরোধরূপ যোগ। তারপর সেই অবর্ণ নিরোধের

ভূমিকায় নতুন করে এক দৃক্‌শক্তি ফোটে। সে প্রথম অন্তরে দেখে (৬।২১)। তার পর সেই দৃক্‌শক্তিই সংক্রামিত হয় এই চোখেই। এটি অতি উচ্চকোটির অবস্থা। অতদূর সবাই উঠতে পারে না। না উঠলেও কোনও খেদ থাকে না, কেননা অন্তরের দেখাতেই অধিকাংশের বুক ভরে যায়, উপচে পড়ে।

প্রশ্ন

বিশ্বরূপ কি জ্যোতির্ঘন মূর্তি, না ব্যাপ্তি? সূর্যের দিকে তো তাকানো যায় না। সহস্র সূর্যের দীপ্তি বা ছটা এই প্রাকৃত চোখের পক্ষে সহ্য করা কি সম্ভব? এইজন্যই কি দিব্যচক্ষু প্রদান করিতে হইয়াছিল ভগবানকে? 'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে' (১১।১৫)—বিশ্বরূপে কি শ্রীকৃষ্ণের দেহ অন্তর্হিত হইয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণদেহেই তো অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন? শ্রীকৃষ্ণের দেহই তো বিরাট দেহে পরিণত হইয়া তাহার মধ্যে সকলকে ধারণ করিয়াছিল?

উত্তর

প্রদীপের জ্যোতি শিখায় সংহত থেকেই সর্বত্র ব্যাপ্ত। সুতরাং জ্যোতির্ঘন মূর্তি যুগপৎ ঘন এবং ব্যাপ্ত। প্রাকৃত চক্ষু একটা সূর্যের ছটাই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু দিব্যচক্ষু তা পারে। আর তার সামর্থ্য যদি প্রাকৃত চক্ষুতে আবিষ্ট হয়, তখন সেও পারে। তবে সবার বেলায় সে-শক্তির আবেশ হয় না—একথা আগেই বলেছি।

বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের দেহ অন্তর্হিত হয়নি। তিনি নিজেই বলছেন, **'ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য** মম দেহে' (১১।৭)। আবার বলছেন, যা 'অদৃষ্টপূর্বাণি আশ্চর্যাণি', তাও দেখ (১১।৬)।

ব্যাপারটা স্বতোবিরোধের ভাষায় ছাড়া ব্যক্ত করা যায় না। বলতে হয়, এ যেন বিন্দুতে সিন্ধুর দর্শন। প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। তার কারণ, তার সমস্ত দর্শনই ভূতাকাশে একটির পাশে আরেকটি সাজিয়ে-সাজিয়ে রেখে তবে দেখা। তখন একই দেশে দুটি বস্তুর যুগপৎ অবস্থান সম্ভব নয় (Two things

cannot occupy the same space)। এই বিভক্ত দর্শনের সংস্কার ছাপিয়ে না উঠতে পারলে 'ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নম্'-এর রহস্য বোঝা যায় না।

বিশ্বরূপদর্শন শুধু বস্তুর দর্শন নয়—একসঙ্গে বস্তু ভাব শক্তি এবং চৈতন্যের দর্শন। শ্রীকৃষ্ণের যে-তনুকে অর্জুন দিব্যচক্ষুর সহায়ে দেখছেন, তা যুগপৎ মর্ত্যতনু ভাবতনু সত্ত্বতনু এবং অতনু। মর্ত্যতনু বাইরে দেখা যায়, ভাবতনু দেখা যায় অন্তরে। কিন্তু দুটি তনুই 'বিভূতি'। সত্ত্বতনুতে বিভূতি সংহত হয়েছে 'সম্ভূতি'তে। কিন্তু সংহত হচ্ছে ভূতাকাশে নয়, চিদাকাশে। এইটি ধারণা করা শক্ত। মাণ্ডূক্যোপনিষদে 'একীভূত প্রজ্ঞানঘন সর্বেশ্বর সর্বযোনি' সুষুপ্তস্থান যে-পুরুষের কথা আছে, তাঁর তনুই সত্ত্বতনু। নিজের মধ্যে সুপ্তি-সমাধির ভূমিতে আত্মশক্তির অনুভব না হলে এই সত্ত্বতনুর রহস্য বোঝা যায় না।

অথচ তাঁর তনুর এইখানেই শেষ নয়। এই সত্ত্বতনুকে ছাপিয়েও আছে শিবতনু বা অতনু—যার মধ্যে 'সাধ্য' বিভূতির বিদ্যুৎ ঝলক হানে, যা অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য (১১।৬), অথচ যা দেখবার ইচ্ছাও হতে পারে অর্জুনের (৭)।

এখানে বৈদিক বিজ্ঞান অনুসারে আত্মা আর তনু এক, ভূতাকাশ আর চিদাকাশ এক, তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভাষায় ভূতাকাশ আত্মারই সম্ভূতি (২।১)। ভগবানের মানুষী তনু এবং তাঁর ভূতমহেশ্বর ভাব ও পরম ভাব এখানে সম্পুটিত (দ্র. ৯।১১)। অণু আর মহৎ, কাল আর আকাশ এখানে এক। তখন যুগপৎ বীজে বনস্পতি এবং বনস্পতিতে বীজের প্রত্যক্ষ। আর এ-প্রত্যক্ষ 'অমানস' বা 'অমানব'। লৌকিক ইন্দ্রিয়জ বা মানস প্রত্যক্ষের সংস্কার থাকতে এ-প্রত্যক্ষ হতে পারে না। বহু হতে একে গিয়ে সেই একরসপ্রত্যয় হতে আবার বিসৃষ্টিতে যদি স্বরূপজ্ঞান নিয়ে নেমে আসা যায়, তবেই এ-প্রত্যক্ষ সম্ভব। তাই বিশ্বরূপের প্রত্যক্ষ

যোগজ। যিনি দেখছেন তিনি যোগী, আর যিনি দেখাচ্ছেন তিনি মহাযোগেশ্বর।

তবুও অর্জুনের বিশ্বরূপদর্শন বেদের পুরুষসূক্তের বিশ্বরূপদর্শনের মত সমগ্র নয়—একদেশী। আসন্ন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পটভূমিকায় লোকক্ষয়কৃৎ কালের রূপটিই এখানে স্ফুটতর।

প্রশ্ন

লোকক্ষয়কৃৎ কালের মুখে সকলেই তো প্রবেশ করে। আমি যুদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছি—ইহাই তো কর্তৃত্বাভিমান। 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্' (১১।৩৩)। ভগবানই তো রক্ষক, আবার তিনিই তো লোকক্ষয়কৃৎ কাল—তবে জীবের মধ্যে কর্তৃত্বাভিমান আসে কেন? ভগবানের ইচ্ছা বা কার্য-সাধনে আমাদের স্বতন্ত্র ক্ষমতা বা শক্তি নাই, ইহাই কি নিমিত্তের অর্থ?

উত্তর

মনে রাখতে হবে বিভূতিযোগের অনুষঙ্গে অর্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শন। বিভূতিযোগের শেষে ভগবান বলেছিলেন, 'বিশ্বের যাতেই কোনও বৈভব শ্রী বা বলের (ঊর্জ্) স্ফুরণ, জানবে তা আমারই তেজের অংশকলা' (১০।৪১)। এখানে সৃষ্টির আরোহক্রম বা ঊর্ধ্ব-পরিণামের কথা বলা হয়েছে—বেদে যাকে বলা হয় 'উৎক্রান্তি'। এর গতি জড় থেকে চিৎএর দিকে—ঐতরেয়ারণ্যকে যাকে বলা হয়েছে প্রজ্ঞানের ক্রমিক উন্মেষ। যেখানে ক্রমোন্মেষ, সেখানেই কালের কথা এসে যায়। কালের একটা অন্তর্গূঢ় চিন্ময় কলনা আছে—আলোর উপচয়ের মত। কিন্তু এই চিন্ময় কলনা ঘটে মৃন্ময় আধারে। চিৎএর উৎকর্ষকে ধারণা করতে গিয়ে মৃৎ বারবার ভেঙে পড়ে। এই ভেঙে পড়াটাই প্রাকৃত মৃত্যু। মৃত্যুও কালের একটা রূপ।

ভগবান অর্জুনকে যে-বিশ্বরূপ দেখালেন, তার দুটি বিভাব। একটিতে কাল চিৎপ্রকর্ষের বাহন, সুতরাং তাতে আছে শাশ্বতাভিমুখী প্রবাহনিত্যতা—সমুদ্রের দিকে নদীর একটানা বয়ে যাওয়ার মত। অর্জুন তার বর্ণনা দিচ্ছেন ১৫ হতে ২০ শ্লোক পর্যন্ত। এটি অনাদিমধ্যান্ত অনন্তবীর্য বিশ্বরূপ (১১।১৯)। এটি ব্যাপ্তিধর্মা এবং আনন্ত্যহেতু অপ্রমেয় বলে সান্ত লোকচেতনার কাছে ব্যথার কারণ (১১।২০)। বিশ্বরূপের এই শাশ্বত বিভাবের পাশেই তার ক্ষণভঙ্গিম বিভাব। তার একটা বর্ণাঢ্য বর্ণনা দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন, 'এই উগ্ররূপ তুমি কে, তুমি কি করতে চাইছ' (১১।৩১)।

ভগবান বললেন, 'আমি লোকক্ষয়কৃৎ কাল। চৈতন্যের আধাররূপে আমি প্রাকৃত রূপকে যেমন আমা হতে বিসৃষ্টি করি, তেমনি আবার যোগ্যতা উপক্ষীণ হলে আমার মধ্যে তাকে গুটিয়ে আনি। এই কুরুক্ষেত্রে এখন তা-ই করতে যাচ্ছি' (১১।৩২)।

এই লোকক্ষয়কৃৎ কালই নেপথ্যে থেকে কুরুক্ষেত্রের সূত্রধার। এর মধ্যে যারা জড়িয়ে পড়েছে, তারা কেউ স্বেচ্ছায় কিছু ঘটিয়ে তোলেনি, যদিও কর্তৃত্বের মূঢ় অহঙ্কার নিয়ে (৩।২৭) তারা ভাবছে, যুদ্ধ করা না-করা আমাদের খুসি! আসলে যুদ্ধটা অবশ্যম্ভাবী, ভগবানের ইচ্ছায় যুগপ্রয়োজনে এটা ঘটছে। অর্জুন এতে যোগ না দিলেও এটা ঘটতই, তিনি সরে দাঁড়িয়েও কাউকে বাঁচাতে পারতেন না (১১।৩২)। কর্তব্যবুদ্ধিতে এক-পা এক-পা করে তিনি এই যুদ্ধের দিকে এগিয়ে এসেছেন, এখন সাময়িক মোহের বশে পিছিয়ে গেলে ঘটনার তিনি গতিরোধ করতে তো পারতেনই না, বরং অন্তরের দিক দিয়ে তাঁরই একটা বড়রকমের ক্ষতি হয়ে যেত।

কর্মযোগের একটা রহস্য এর মধ্যে নিগূঢ় হয়ে আছে—সেটি ভাল করে বোঝা দরকার। জগৎটা চলছে আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছায় নয়, 'শাশ্বতধর্মগোপ্তা এক সনাতন পুরুষের (১১।১৮) ইচ্ছায়'। এই শাশ্বত ধর্মের স্বরূপটি আমরা বুঝতে পারি, যদি নিজেদের মনগড়া

ধর্মাধর্মের—যেমন তথাকথিত 'শাশ্বত জাতিধর্ম এবং কুলধর্মে'র (১।৪২)—সংস্কার পরিত্যাগ করে নিজেকে ঠিক তাঁর হাতের যন্ত্র করে তুলতে পারি (১৮।৫৯-৬২,৬৬)। তখন যে-বুদ্ধি নিয়ে আমরা কাজ করি, তা সুকৃত-দুষ্কৃতের উর্ধ্বে তাঁর দেওয়া বুদ্ধি (২।৫০,১০।১০)। তখন 'তিনিই সব ছেয়ে আছেন, আমাদের সব প্রবৃত্তি তাঁহতেই উৎসারিত হচ্ছে'—এই বুদ্ধিতে আমাদের স্বকর্ম অর্থাৎ স্বভাবানুকূল নিয়ত কর্ম রূপান্তরিত হয় তাঁর অর্চনায় এবং তা-ই কর্মযোগী মানবের পরমা সিদ্ধি (১৮।৪৬)।

এই হল নিমিত্তকর্তা বা প্রযোজ্যকর্তার ভাব। এ-ভাব প্রাকৃতচিত্তে আচ্ছন্ন থাকে অজ্ঞানজ তমের দ্বারা। তিনি যদি অনুকম্পা করে জীবের আত্মভাবস্থ হয়ে জ্ঞানের দীপটি জ্বালিয়ে তোলেন (১০।১১), তবেই তার কর্তৃত্বাভিমান দূর হতে পারে। তার জন্য আগে কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্মের দর্শনে কৃৎস্নকর্মকৃৎ অথচ অকর্তা (৪।১৮) হতে শিখতে হয়—তারপর নিমিত্তকর্তা এবং অবশেষে তাঁর সাধর্ম্যপ্রাপ্ত (১৪।২) দিব্যকর্তা (তু. ৪।৯) হওয়ার অধিকার জন্মে।

প্রশ্ন

'ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ' (১১।৩৭-৩৮)। শ্লোকদুইটির তাৎপর্য বা রহস্যার্থ ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়।

উত্তর

'ত্বমক্ষরং পুরুষম্' ইত্যাদি বিশ্বরূপ পুরুষের স্বরূপাখ্যান। এই পুরুষের তিনটি বিভাব—তিনি বিশ্বাতীত বিশ্বরূপ এবং সবিগ্রহ (৯।১১)। অর্জুন সবিগ্রহরূপে তাঁকে সাক্ষাৎ করছেন। এটি সূচিত হচ্ছে 'ত্বম্' এই সর্বনামের দ্বারা। তিনি 'অক্ষর' এই বিশেষণে সূচিত হচ্ছে তাঁর পরম ভাব (তু. ৮।৩)। যিনি অক্ষর তাঁর আবার দুটি বিভাব—ইতি প্রত্যয়ে তিনি 'সৎ' আবার নেতি প্রত্যয়ে 'অসৎ'। সৎ আর অসৎএ এখানে কোনও বিরোধ নাই—বিরোধটা আমাদের

মনঃকল্পিত। বিজ্ঞানে এই বিরোধ নাই। বেদও তাই বলছেন, 'অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্'—অসৎ আর সৎ দুই-ই আছে পরম ব্যোমে। দার্শনিকের ভাষায় তিনি 'সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ঃ' অতএব 'তৎ পরং যৎ'—যা তৎ কিনা সৎ ও অসৎএর ওপারে। এই বিশ্বাতীত অদ্বয়তত্ত্বই 'পুরুষ' হয়েছেন—বেদে যাঁকে বলা হয়েছে 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' ইত্যাদি। পুরুষ চিৎস্বরূপ, তাঁর বৈদিক সংজ্ঞা 'দেব'। তিনি 'আদিদেব' কিনা বিশ্বদেবের বা নিখিল চিদ্‌বিভূতির উৎস। তাঁহতেই কালের অতএব বিসৃষ্টির প্রবর্তনা, অতএব তিনি 'পুরাণ'। এই আদিদেবই হলেন বিশ্বের পরম নিধান বা উৎস—তিনিই এই সব-কিছু হয়েছেন : 'পুরুষ এব ইদং সর্বম্'। এইখানে তাঁর বিশ্বরূপাত্মক পরিচয়। তিনি এক হয়েও বহু হয়েছেন এবং বহুর প্রত্যেকের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে আবিষ্ট হয়ে আছেন। তাঁর এই আবেশ সর্বভূতের চিন্ময়ত্বের হেতু। তাই মানুষের মধ্যে বিশেষ করে ধরে জিজ্ঞাসার রূপ। অন্তরে গুহাহিত হয়ে কেউ যেন আছেন, তাঁকে আমরা জানতে চাই। তাই তিনি 'বেদ্য'। আমাদের বিদ্যার অভিযান পরিসমাপ্ত হয় তাঁর পরম পদে, তাই তিনি আমাদের 'পরম ধাম'। সেখানে পৌঁছলে দেখি, আমাদের বিদ্যা তাঁর প্রজ্ঞানের প্রচ্ছটা। আমাদের বিদ্যা তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, তিনি স্বপ্রকাশ; তাঁর প্রকাশই আমাদের মধ্যে বিদ্যার রূপ ধরে। তিনি স্বরূপত কি, তা তিনিই জানেন। আর যতটুকু তিনি আমাদের জানিয়ে দেন, আমরা ততটুকুই তাঁকে জানতে পারি। তাই তিনি 'বেত্তা'।

এ সব হল ভিতরের কথা। বাইরেও আমরা তাঁকেই বিশ্বে দেখছি অনন্তরূপে—তিনিই সব-কিছু ছেয়ে আছেন। এটি বিশ্বরূপে তাঁর চিন্ময় প্রত্যক্ষ।

প্রশ্ন

মহিমবোধের অভাবেই ভগবানকেও আমরা প্রাকৃত মনে করি। বিশ্বরূপ দর্শন করার পরই অর্জুনের মধ্যে যথার্থ মহিমজ্ঞান বা ঐশ্বর্যবোধ জাগ্রত হইয়াছিল। পিছনে মহিমজ্ঞান না থাকিলে ভগবানেও প্রাকৃত ভাব দেখা দেয়। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সখাই মনে করিতেন (১১।৪১)। সম্বন্ধের মাধুর্য এখানে থাকিলেও মহিমবোধের অভাবে প্রাকৃত। প্রাকৃত ভাবের মলিনতা বিশ্বরূপ দর্শনেই তো তিরোহিত হইয়াছিল ?

উত্তর

মহিমজ্ঞান অধ্যাত্ম অনুভবের ভিত্তি। বৃহতের বোধ ছাড়া ক্ষুদ্রতা দূর হয় না। বৃহৎকে জেনে বৃহৎ হওয়াই দেবতার সাযুজ্য লাভ করা এবং তা-ই মানুষের নিয়তি। এটা হল প্রাথমিক বিচার। কিন্তু ক্ষুদ্র-বৃহৎএর পারস্পরিক সম্পর্কের আরও একটা গভীর দিক আছে।

'বৃহৎ' ব্রহ্ম বা ভূমা বা পুরুষ। আর 'ক্ষুদ্র' পুরুষেরই বিভূতি বা প্রকৃতি। গীতায় ভগবান তাঁর দুটি প্রকৃতির কথা বলেছেন—একটি অপরা, আরেকটি পরা (৭।৪-৫)। অপরা প্রকৃতি মলিনসত্ত্বপ্রধানা আর পরা প্রকৃতি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা। অপরা প্রকৃতির মালিন্য দূর হয়ে পরা প্রকৃতির স্ফুরণই হল সমস্ত সাধনার লক্ষ্য।

জীবভূতা পরা প্রকৃতিকে বেদে বলা হয়েছে মধ্বদ, পিপ্পলাদ, অঙ্গুষ্ঠমাত্র অধূমক জ্যোতি ; গীতায় 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' (১৫।৭)। এর সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক মধুর। লৌকিক দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবে সে-মাধুর্যের কিছুটা প্রতিফলিত হয়। ভগবানে এইসব ভাবের আরোপ করে 'প্রণয়' (১১।৪১) বা প্রেমের সাধনা।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, ঈশ্বরে আরোপিত ওই সব ভাব কোনক্রমেই প্রাকৃত ভাব নয়। প্রাকৃত ভাবে ক্ষুদ্রের মলিনতা আছে, অপ্রাকৃত ভাবে তা নাই—বেদের ভাষায় 'ধাতুপ্রসাদহেতু আত্মার

মহিমবোধে'র উপরেই তার প্রতিষ্ঠা। নারদ তাই বলছেন, কৃষ্ণের মহিমবোধে মহিমময়ী না হয়ে গোপী যদি কৃষ্ণকে ভালবাসে, তাহলে সে-ভালবাসা ভগবানকে ভালবাসা নয়—জীবকে ভালবাসা। অর্থাৎ অন্তরের গভীরে একটা সাযুজ্যবোধ থাকা চাই, প্রাকৃত-লোক হতে লোকোত্তরে চেতনার উত্তরণ হওয়া চাই, তবেই সম্বন্ধতত্ত্বের চিন্ময় আস্বাদন সম্ভব। নইলে সব মাকেই যশোদা, সব কুলটাকেই রাধা বলা যেত।

চেতনার এই-যে উত্তরণ, মহিমবোধ তার হেতু। মহিমবোধ অপরা প্রকৃতিকে স্তব্ধ এবং পরা প্রকৃতিকে স্ফুরিত করে। এই পরা প্রকৃতিতে তখন দিব্যভাবের স্ফুরণ হয়। এই দিব্যভাব হল ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্যের বোধ। সে-বোধে হয় ক্ষুদ্র অহংএর প্রলয় হয়, অথবা তার রূপান্তর ঘটে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'নুনের পুতুল সমুদ্রে নামতে গিয়ে গলে যায়। কিন্তু নুন জমে যদি পাথর হয়, তাহলে আর সে গলে না।'

আগেরটিতে বলা যায়, নুনের পুতুল সমুদ্র হয়ে গেল—আর পুতুল রইল না। পরেরটিতে সমুদ্রই নুন জমিয়ে পুতুল হল। দুটিরই পটভূমিকায় সমুদ্র। আর সমুদ্র মহিমময়। দুটি অবস্থাই অনুভবের চরম।

কিন্তু চরম অনুভবের আগে একটা তটস্থ অবস্থা আছে। অর্জুনের সেই অবস্থা। প্রাকৃতভূমিতে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না জেনে তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছেন (৯।১১), তাঁকে প্রমাদের বশে 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা' বলে সম্বোধন করেছেন। তবে কিনা এ-আচরণের সবটুকুই প্রমাদ নয়। এর মধ্যে প্রণয়ও আছে। সত্যিই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সখাই মনে করতেন (১১।৪১)। ওইটুকু সম্বন্ধের মাধুর্য, কিন্তু মহিমবোধের অভাবে প্রাকৃত।

বিশ্বরূপদর্শনে ফুটল ভগবানের ঐশ্বর্যরূপ, অর্জুনের মধ্যে জাগল মহিমজ্ঞান। প্রাকৃত ভাবের মলিনতা একটা প্রচণ্ড আঘাতে অবসন্ন

যায়। সূত্রগুলি গুরুর বেলাতেও প্রযোজ্য—কেননা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শাস্তা বা গুরু, আর অর্জুন শিষ্য (২।৭)।

প্রথমত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানুষরূপ দিয়ে সাধনার শুরু। এটি প্রাকৃত চিত্তের উপযোগী। তখন মহিমা ঠিক জানি না বুঝি না—কিন্তু তাঁকে ভালবাসি। অপরা প্রকৃতির ভালবাসা, তাই তার মধ্যে খাদ আছে। সে-খাদ দূর হয় তত্ত্বজ্ঞানে। যে-মানুষরূপটি ভালবাসি, তার তত্ত্ব কি বুঝতে পারলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের গভীরে এবং তাকে ছাপিয়ে ফোটে বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ। তখন অপরা প্রকৃতির অধিকার নিবৃত্ত হয়ে শুরু হয় পরা প্রকৃতির অধিকার।

এইটি নিজের চেষ্টায় হতে পারে। কিন্তু রূপদর্শনের এইখানেই শেষ নয়। তত্ত্বরূপ দর্শনের সাধন হল বুদ্ধি। বুদ্ধি অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু তবুও পুরুষতত্ত্বে সে পৌঁছতে পারে না। পুরুষকে সে দেখে তার দিক থেকে আভাসে—কিন্তু তাঁর দিক থেকে প্রভাসে নয়।

প্রভাসে দর্শন বুদ্ধির সাধ্য না হলেও এটি ঘটে কিন্তু তারই ঐকান্তিকতায়। ঐকান্তিকতার ফল তন্ময়তা—আর তন্ময়তায় মন্ময়তার আবরণ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গিয়ে নিয়ে আসে 'স্বরূপশূন্যতা' বা একটা আত্মহারা ভাব। তখন আর আমি থাকি না, আধারের সবটুকু নির্ভাসিত করে ফোটেন তিনি। এই তাঁর দিব্যচক্ষুদানের প্রসাদ। তিনি দেখান বলেই তাঁকে দেখি—বাইরে-ভিতরে, জাগ্রতে-স্বপ্নে-সুষুপ্তিতে। দেখি দয়ালরূপে-ভয়ালরূপে, অমৃতরূপে-মৃত্যুরূপে, সমস্ত দ্বন্দ্বের সমাহারে সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীতরূপে। এই তাঁর বিশ্বরূপের দর্শন—দর্শন অনন্ত কাল জুড়ে কালরূপে—'শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'।

এই একটি অপ্রমেয়ের দর্শন—বিশ্বমূর্তির (১১।৪৬) দর্শন। তার-পর এই দর্শনেরই অনুবৃত্তিতে আরেকটি অপ্রমেয়ের দর্শন—অমূর্ত অব্যক্ত রূপে। সেখানে 'ন সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,…তমের ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং, তস্যের ভাসা সর্বমিদং রিভাতি'। সে-ও দেখা—

কিন্তু চোখ দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়, এমন-কি প্রজ্ঞানঘনতা দিয়েও নয়—নিজের প্রয়াসে তো নয়ই। তাঁর 'নীলং পরঃকৃষ্ণং' রূপ তিনিই দেখান, আবার চোখ হয়ে দেখেনও।

এইপর্যন্ত দর্শনের উজান ধারা। আবার তাঁরই প্রসাদে তাঁর অব্যক্তরূপ বিশ্বরূপ আর তত্ত্বরূপ ভাটার টানে এসে সংহত হয় মানুষ-রূপে। তখন তাঁকে দেখি 'ইহৈর দেহে'। প্রতিটি স্ফুলিঙ্গে সূর্যের দর্শন। সূর্যসহস্রের যুগপদুত্থিতা ভাতির দর্শন (১১।১২)। দেখে যেমন পরম বিস্ময়ে হর্ষিত হই, তেমনি ভয়ে প্রব্যথিতও হই (১১।৪৫)। কাতর হয়ে বলি, 'আর যে পারছি না। এবার প্রসন্ন হয়ে দেখাও তোমার চতুর্ভুজ তত্ত্বরূপ, তোমার সৌম্য মানুষ-রূপ (১১।৪৬,৫১)।

বুদ্ধির ওপারের দর্শন আর সেই দর্শনকে আবার এখানে নামিয়ে আনা দুই-ই সম্ভব তাঁর প্রসাদে। কিন্তু তাঁর প্রসাদ খামখেয়ালি নয়, তারও একটা ঋতচ্ছন্দ আছে। প্রসাদ সবসময় উদ্যত হয়েই আছে, কিন্তু তবুও তা আমার সম্মতির অপেক্ষা রাখে। আমার অহং গিয়ে চিত্ত ফাঁকা না হওয়া পর্যন্ত প্রসাদের সত্যকার অনুভব হয় না। 'আমি নাই, শুধু তুমিই আছ'—এই আত্মবিসর্জনের যে-রস, তারই নাম ভালবাসা। এই ভালবাসাই জীবের পরমপুরুষার্থ। তার জন্যই বেদানুবচন, যজ্ঞ, তপ আর দান-রূপ বহিরঙ্গ সাধনা (১১।৫৩; তু. ১৮।৫)। কিন্তু বহিরঙ্গ সাধনায় পরমরূপে তাঁকে পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় ভালবাসায়।

এই ভালবাসা বা 'প্রণয়ে'র বীজ অর্জুনের মধ্যে ছিল—যদিও প্রাকৃত ভূমিতে তা ছিল প্রমাদে আচ্ছন্ন। কিন্তু অর্জুন তাঁর দিব্য-কর্মের সহায়, তাঁর ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত। তাই তিনিই তার প্রমাদ দূর করে তাকে দিব্যচক্ষু দিলেন—জ্ঞান আর প্রেমের দীপটি তার হৃদয়ে জ্বালিয়ে তুলে (তু. ৯।১০-১১, ১১।৪৭,৪৮,৫৩,৫৪)।

যায়। সূত্রগুলি গুরুর বেলাতেও প্রযোজ্য—কেননা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শাস্তা বা গুরু, আর অর্জুন শিষ্য (২।৭)।

প্রথমত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানুষরূপ দিয়ে সাধনার শুরু। এটি প্রাকৃত চিত্তের উপযোগী। তখন মহিমা ঠিক জানি না বুঝি না—কিন্তু তাঁকে ভালবাসি। অপরা প্রকৃতির ভালবাসা, তাই তার মধ্যে খাদ আছে। সে-খাদ দূর হয় তত্ত্বজ্ঞানে। যে-মানুষরূপটি ভালবাসি, তার তত্ত্ব কি বুঝতে পারলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের গভীরে এবং তাকে ছাপিয়ে ফোটে বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ। তখন অপরা প্রকৃতির অধিকার নিবৃত্ত হয়ে শুরু হয় পরা প্রকৃতির অধিকার।

এইটি নিজের চেষ্টায় হতে পারে। কিন্তু রূপদর্শনের এইখানেই শেষ নয়। তত্ত্বরূপ দর্শনের সাধন হল বুদ্ধি। বুদ্ধি অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু তবুও পুরুষতত্ত্বে সে পৌঁছতে পারে না। পুরুষকে সে দেখে তার দিক থেকে আভাসে—কিন্তু তাঁর দিক থেকে প্রভাসে নয়।

প্রভাসে দর্শন বুদ্ধির সাধ্য না হলেও এটি ঘটে কিন্তু তারই ঐকান্তিকতায়। ঐকান্তিকতার ফল তন্ময়তা—আর তন্ময়তায় মন্ময়তার আবরণ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গিয়ে নিয়ে আসে 'স্বরূপশূন্যতা' বা একটা আত্মহারা ভাব। তখন আর আমি থাকি না, আধারের সবটুকু নির্ভাসিত করে ফোটেন তিনি। এই তাঁর দিব্যচক্ষুদানের প্রসাদ। তিনি দেখান বলেই তাঁকে দেখি—বাইরে-ভিতরে, জাগ্রতে-স্বপ্নে-সুষুপ্তিতে। দেখি দয়ালরূপে-ভয়ালরূপে, অমৃতরূপে-মৃত্যুরূপে, সমস্ত দ্বন্দ্বের সমাহারে সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীতরূপে। এই তাঁর বিশ্বরূপের দর্শন—দর্শন অনন্ত কাল জুড়ে কালরূপে—'শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'।

এই একটি অপ্রমেয়ের দর্শন—বিশ্বমূর্তির (১১।৪৬) দর্শন। তার-পর এই দর্শনেরই অনুবৃত্তিতে আরেকটি অপ্রমেয়ের দর্শন—অমূর্ত অব্যক্ত রূপে। সেখানে 'ন সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,…তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং, তস্যৈব ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। সে-ও দেখা—

কিন্তু চোখ দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়, এমন-কি প্রজ্ঞানঘনতা দিয়েও নয়—নিজের প্রয়াসে তো নয়ই। তাঁর 'নীলং পরঃকৃষ্ণং' রূপ তিনিই দেখান, আবার চোখ হয়ে দেখেনও।

এইপর্যন্ত দর্শনের উজান ধারা। আবার তাঁরই প্রসাদে তাঁর অব্যক্তরূপ বিশ্বরূপ আর তত্ত্বরূপ ভাটার টানে এসে সংহত হয় মানুষ-রূপে। তখন তাঁকে দেখি 'ইহৈব দেহে'। প্রতিটি স্ফুলিঙ্গে সূর্যের দর্শন। সূর্যসহস্রের যুগপদুত্থিতা ভাতির দর্শন (১১।১২)। দেখে যেমন পরম বিস্ময়ে হর্ষিত হই, তেমনি ভয়ে প্রব্যথিতও হই (১১।৪৫)। কাতর হয়ে বলি, 'আর যে পারছি না। এবার প্রসন্ন হয়ে দেখাও তোমার চতুর্ভুজ তত্ত্বরূপ, তোমার সৌম্য মানুষ-রূপ (১১।৪৬,৫১)।

বুদ্ধির ওপারের দর্শন আর সেই দর্শনকে আবার এখানে নামিয়ে আনা দুই-ই সম্ভব তাঁর প্রসাদে। কিন্তু তাঁর প্রসাদ খামখেয়ালি নয়, তারও একটা ঋতচ্ছন্দ আছে। প্রসাদ সবসময় উদ্যত হয়েই আছে, কিন্তু তবুও তা আমার সম্মতির অপেক্ষা রাখে। আমার অহং গিয়ে চিত্ত ফাঁকা না হওয়া পর্যন্ত প্রসাদের সত্যকার অনুভব হয় না। 'আমি নাই, শুধু তুমিই আছ'—এই আত্মবিসর্জনের যে-রস, তারই নাম ভালবাসা। এই ভালবাসাই জীবের পরমপুরুষার্থ। তার জন্যই বেদানুবচন, যজ্ঞ, তপ আর দান-রূপ বহিরঙ্গ সাধনা (১১।৫৩; তু. ১৮।৫)। কিন্তু বহিরঙ্গ সাধনায় পরমরূপে তাঁকে পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় ভালবাসায়।

এই ভালবাসা বা 'প্রণয়ে'র বীজ অর্জুনের মধ্যে ছিল—যদিও প্রাকৃত ভূমিতে তা ছিল প্রমাদে আচ্ছন্ন। কিন্তু অর্জুন তাঁর দিব্য-কর্মের সহায়, তাঁর ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত। তাই তিনিই তার প্রমাদ দূর করে তাকে দিব্যচক্ষু দিলেন—জ্ঞান আর প্রেমের দীপটি তার হৃদয়ে জ্বালিয়ে তুলে (তু. ৯।১০-১১, ১১।৪৭,৪৮,৫৩,৫৪)।

অর্জুনের জীবনের প্রতিফলন আমাদের জীবনে—তার আলো-ছায়া দুই নিয়েই। বাসুদেব আর অর্জুন, নারায়ণ আর নর—একই পুরুষতত্ত্বের দুটি মেরু। একদিন বাসুদেবার্জুনের যুগল-উপাসনা ভারতবর্ষে বহুপ্রচলিত ছিল—পাণিনির সূত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন

'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন! জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥' (১১।৫৪)—এই শ্লোকটির রহস্যার্থ কি? 'জ্ঞাতুং' 'দ্রষ্টুং' 'প্রবেষ্টুং' প্রত্যেকটি শব্দের তাৎপর্য জানিতে চাই। একাদশ অধ্যায়ের সর্বশেষ শ্লোকে ভগবান নিজে তৎপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিয়াছেন, নয় কি? মৎকর্মকৃৎ, মৎপরমঃ, মদ্ভক্তঃ, সঙ্গবর্জিতঃ, নির্বৈরঃ,—প্রত্যেকটি শব্দের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়।

উত্তর

'অহম্ এবং বিধঃ'—আমি এই রকম। কি রকম, তা আগেই বলা হয়েছে। তিনি ব্যক্তিবিগ্রহ, বিশ্ববিগ্রহ এবং অবিগ্রহ। ব্যক্তি-বিগ্রহকেই অর্জুন দেখলেন বিশ্ববিগ্রহরূপে। সমুদ্রে স্রোতের চোরাটানের মত এ-দর্শনেরও একটা সঙ্কর্ষণশক্তি আছে যা রূপকে অরূপে মিলিয়ে দিতে চায়। চিত্তের সমস্ত রূপ-সংস্কারে তখন টান ধরে, আর সরূপ অস্তিত্বের শিকড় পর্যন্ত যেন উপড়ে আসে। তখন যে-ভয় জাগে, শাস্ত্রে তার সংজ্ঞা হল 'মোক্ষভীতি'। ও যেন কালের চরম গ্রাস হতে বাঁচবার জন্য আকুলি-বিকুলি। এর একটি বর্ণাঢ্য বর্ণনা আমরা পেয়েছি অর্জুনের দিশাহারা উক্তিতে (তু. ১১।২৪,২৫,৪৫)।

এই করাল দর্শনের পর সবাই ফিরে আসে না। তাঁকে দেখা শুধু অমৃতরূপে নয়—মৃত্যুরূপে, বিনাশরূপে। নচিকেতার বৈবস্বত যমকে দেখার মত। সে-দেখার পর 'মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্ত' হয়ে যে

ফিরে আসে, সে নিজের ইচ্ছায় আসে না, আসে তাঁর ইচ্ছায় তাঁর প্রসাদে। এইখানে অনন্যা ভক্তির অবকাশ। কথাটা একটু তলিয়ে বোঝা দরকার।

বিনাশ বা মৃত্যু সমস্ত জীবের সাধারণ নিয়তি। অর্জুন গোড়াতেই তার একটা বর্ণনা দিয়েছেন (১১।২১,২৬-৩০)। বিনাশকে সবাই ভয় করে, কৃতাঞ্জলি হয়ে তাকে ঠেকাতে চায় – কিন্তু পারে না। জ্ঞানী কিন্তু 'স্বস্তি' বলে তাকে বরণ করে নেন (১১।২১)। এমন-কি বিনাশের মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করেন। এই হল অনাবৃত্তি বা নির্বাণের পথ। স্বেচ্ছায় শূন্যের মধ্যে ঝাঁপ দিলাম, সঙ্গে-সঙ্গে শেষ ইচ্ছার লয় হল—আর ফিরবে কে?

তবুও যে ফিরে আসে, সে আসে স্বেচ্ছায় নয়—পরেচ্ছায়। এই 'পর' সেই পরমপুরুষ—যাঁর ইচ্ছাই বস্তুত তাকে বিনাশের পথে টেনে নিয়েছিল। এই ইচ্ছাকে কোনও স্বীকৃতি না দিয়েও কিন্তু শূন্যের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া যায়। যাত্রী তখন একা। কিন্তু ফেরবার সময় সে আর একা নয়। তার কোনও ইচ্ছাই তো ছিল না—থাকলে পরমকে অনিঃশেষে পাওয়া আর হত না। তাহলে কে তাকে ফিরিয়ে দিল? তখন আত্মবোধকে ছাপিয়ে জাগে পরমাত্মার বোধ। আর এই বোধই ভক্তির বীজ। জ্ঞানে প্রলয়, আর ভক্তিতে সেই প্রলয়ের গ্রাস থেকে ফিরে এসে আবার এই জগতে পরমের সঙ্গে চিন্ময় বিলাস। ভক্তিতে তাই জ্ঞানের পূর্ণতা। তখন তাঁর এদিক-ওদিক দুদিক দেখা হয়ে যায়, আর তাইতে তাঁকে পুরাপুরি পাওয়াও যায়।

পাওয়ারও তিনটি ধাপ। একটি তত্ত্বজ্ঞান, আরেকটি তত্ত্বদর্শন, আর অবশেষে প্রবেশ। তিনটিতে অনুভবের গাঢ়তার তারতম্য আছে। জ্ঞান মানস-প্রত্যয়। গীতায় মনকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরা হয়েছে (১৫।৭)। অতএব জ্ঞান অতীন্দ্রিয় নয়। তত্ত্বদর্শন বৌদ্ধ-

প্রত্যয়। বুদ্ধি মনের উজানে—গীতাতে তার একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে, তা বেদের 'প্রতিবোধ' বা 'বোধি'র সগোত্র। এই বুদ্ধি তাঁর দান (১০।১০-১১)। বৌদ্ধ তত্ত্বদর্শন দু'রকমের হতে পারে—যেমন অন্তরে তাঁকে চতুর্ভুজরূপে দেখা, আবার অন্তরে-বাইরে বিশ্বমূর্তিতে দেখা (তু. ১১।৪৬)।

এই বিশ্বরূপ দর্শনের পর তাঁতে প্রবেশ—সমুদ্র-স্রোতের সেই চোরাটানে, যার কথা আগে বলেছি। প্রবেশের ফল সাযুজ্য এবং তন্ময়তা।

তারপর আবার তাঁর ইচ্ছাতেই তন্ময় হয়ে ফিরে আসা তাঁর জগতে। ফিরে আসা 'পরম'কে পেয়ে, অতএব তাঁর প্রতি অনন্যা 'ভক্তি' নিয়ে। ফিরে এলে কর্ম থাকবেই। কিন্তু সে-কর্ম তো গরজের কর্ম নয়, তাঁর 'কর্ম'। কাজেই তা 'সঙ্গবর্জিত'। তাঁর কর্ম দিব্য কর্ম, তাঁর বিসৃষ্টির উল্লাস (৪।৯,৮।৩)। তাই তাতে রস আছে, কিন্তু আসক্তি নাই—যেন গাছের ফুল ফোটানোর মত। আমার কর্মও তখন তা-ই। আর তাঁকে ভালবেসে যখন তাঁর জগতে এসেছি, তখন রূপে-রূপে দেখব তাঁরই প্রতিরূপ, দেখব সবই তিনি। তখন কুরুক্ষেত্রেও আমি 'নির্বৈর'—আমার বৈরী কেউ নাই। শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, 'নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু'।

অথচ চোখের সামনে কুরুক্ষেত্র ঘটতে যাচ্ছে, এবং আমি তাতে যোগও দেব—কেননা আমি যে তাঁর 'সব্যসাচী নিমিত্ত' (১১।৩৩)।

শ্লোকটি সাধক এবং সিদ্ধ দুয়ের পক্ষেই খাটে। অভিধেয়ার্থ সাধকের বেলায়, ব্যঙ্গ্যার্থ সিদ্ধের বেলায়। অনুশাসনের এটি একটি প্রাচীন রীতি।

প্রশ্ন

'ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥' (১২।২)। যোগবিত্তম বা যুক্ততম ভক্ত কে? অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষা দেহাভিমানী জীবের পক্ষে 'ময়ি' আবেশিতচিত্ত হওয়াই সহজ। 'ময্যাবেশ্য' বলিতে কাহাকে বুঝিব? ব্যক্তব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই কি সর্বোত্তম?

উত্তর

যে বাসুদেব কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন নিজের দেহে, প্রকরণের অনুরোধে 'ময়ি' বলতে অবশ্য তাঁকেই বুঝব। পরম শ্রদ্ধায় যিনি তাঁতে নিত্যযুক্ত, সেই ভক্তই যুক্ততম। এই ভক্তি জ্ঞানের পরিপাক। গীতার প্রথম দিকে জ্ঞানের কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে। পরে যে কূটস্থ অক্ষর-পুরুষের কথা বলা হয়েছে (১৫।১৬), জ্ঞানী তাঁরই উপাসক। আর ভক্ত পুরুষোত্তমের (১৫।১৭-১৮) উপাসক।

অক্ষর-পুরুষ পুরুষোত্তমের অন্তর্ভূত। সুতরাং যিনি পুরুষোত্তমের উপাসনা করেন, অক্ষর-পুরুষের চেতনা তাঁর মধ্যে অতি সহজেই থাকতে পারে—পুরুষোত্তমের অনির্বচনীয়তাকে আশ্রয় ক'রে। ব্যক্তের উপাসনাই করি, আর অব্যক্তের উপাসনাই করি, কোনও উপাসনাতেই আমরা তাঁকে ফুরিয়ে ফেলতে পারি না। আমাদের সমস্ত বোধকে ছাপিয়ে সবসময় তিনি পরম আশ্চর্য হয়েই থাকেন আমাদের কাছে (তু. ২।২৯)।

অক্ষরের উপাসনায় তাঁকে পাই নেতি-নেতি করে। সে-পাওয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয়। ইতিরূপে পাওয়া তার পরিপূরক। তখন দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে তাঁকে পাওয়া—একেবারে ষোলআনা পাওয়া। উপনিষদে নেতিবাদের প্রবক্তা যাজ্ঞবল্ক্যও হৃদয় দিয়ে ব্রহ্ম পাওয়াকে বলেছেন পরম পাওয়া।

লক্ষণীয়, শ্রীকৃষ্ণ অব্যক্তের উপাসনাকে নিরাকৃত করেননি, কেবল দেহবোধ থাকতে তাতে আসক্তচেতা হওয়াটাকে ক্লেশের কারণ বলেছেন (১২।৫)।

প্রশ্ন

মৃত্যুসংসার-সাগর হইতে 'অহং সমুদ্ধর্তা' (১২।৬)। এই 'অহং' কে? অভ্যাসযোগ, মৎকর্মযোগ, সর্বকর্মফলত্যাগযোগের একটু ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়। অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান; ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ (১২।১২)—এদের রহস্যার্থ কি?

উত্তর

মৃত্যুসংসারসাগর হতে সমুদ্ধর্তা এখানে অবশ্যই পুরুষোত্তম। এখানেও প্রকরণের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কেবল অক্ষরের উপাসনাতেই যে অমৃত হওয়া যায়, তা নয়; পুরুষোত্তমের উপাসনারও সেই একই ফল।

জ্ঞানযোগই হ'ক আর ভক্তিযোগই হ'ক, সমস্ত যোগের মূলকথা হচ্ছে চঞ্চল চিত্তকে সমাহিত করা। চিত্তসমাধান একদিনে হয় না—বৈরাগ্যসহকৃত অভ্যাসের দ্বারা তা হতে পারে, একথা ভগবান আগেই বলেছেন (৬।৩৫)। তখন তিনি যে-যোগের কথা বলেছিলেন, তাতে একজায়গায় আসনে বসে যোগাভ্যাসের প্রসঙ্গ এসে গিয়েছিল (৬।১০-১৪)। কিন্তু সকলের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাদের জন্য অষ্টাঙ্গযোগের প্রবক্তা পতঞ্জলিও ক্রিয়াযোগের উপদেশ দিয়েছেন, বলেছেন তাতেও অষ্টাঙ্গযোগের ফল পাওয়া যায়।

ক্রিয়াযোগ হল চলতে-ফিরতে যোগ। তার তিনটি অঙ্গ—তপঃ, স্বাধ্যায় আর ঈশ্বরপ্রণিধান। শারীর বাঙ্‌ময় এবং মানস তপের তথা সাত্ত্বিক 'তপে'র কথা গীতায় বিস্তৃতভাবেই বলা হয়েছে (১৭।১৪-১৭)। তার মূলকথা হল ভাবসংশুদ্ধি এবং ব্যবহারশুদ্ধি।

'স্বাধ্যায়'কে গীতায় বলা হয়েছে ঈশ্বরের অনুস্মৃতি (দ্র. ৮।৭,৯,১৩); যা জীবনে-মরণে সব সময় সব অবস্থায় চলতে পারে। এরই পরিপাকে 'ঈশ্বর-প্রণিধান'। এখানে তাকে বলা হয়েছে, 'তাঁতেই মন আহিত করা, বুদ্ধি নিবিষ্ট করা' (১২।৮)।

এখন আসনে বসে তাঁতে চিত্তসমাধানের সুযোগ বা সময় যদি কারও না হয়, ভগবান তাকে বলছেন তাঁকে লক্ষ্য করে ক্রিয়া-যোগের অভ্যাস করতে। কাজ-কর্ম সবই করবে, কিন্তু মনটি ফেলে রাখবে ঈশ্বরের উপর—শুদ্ধ ভাব নিয়ে তাঁর স্মরণ-মননে কাটাবে। কিন্তু কখনও-কখনও তাও সম্ভব হয় না—মনটি তাঁকে দিয়ে যন্ত্রের মত কাজ করা চলে না, মন-বুদ্ধির ব্যাপার দিয়ে কাজও করতে হয়। ভগবান বলছেন, 'তা যদি হয়, তো মনে করবে এ-কাজ আমারই কাজ; যা করছ, আমার জন্যই করছ।' তাও যদি না হয়, তাঁর সঙ্গে যোগ রেখে কাজ করা যদি সম্ভব না হয়, কাজ করবার সময় 'তোমার জন্য করছি'—এও যদি মনে না থাকে? ভগবান বললেন, 'তাহলে যেমন করছ, তেমনি সব কাজ করে যাও—কেবল কোনও কর্মেরই ফল চেয়ো না। ফলাকাঙ্ক্ষায় মন দুরাগ্রহী হয়, অস্থির হয়—ওইখানে তার রাস টেনে ধর।'

তবে কিনা, এ-ও সহজ নয়। ফলাকাঙ্ক্ষায় চিত্ত বহির্মুখ হয়, চঞ্চল হয়। আকাঙ্ক্ষা ছাড়তে হলে চিত্তকে অন্তর্মুখ করতে হয়, একতান করতে হয়। তখন সে হয় ধ্যানচিত্ত—সবকিছুতে থেকেও যেন সবকিছু থেকে আলাদা, যেন অন্তরের একটা ভাবে বিভোর। এই ধ্যানচিত্ততা আসতে পারে জ্ঞান হতে। জ্ঞান কিনা বিবেকজ্ঞান—যা নিয়ে মেতে আছি তা চাই না, চাই গভীরের একটা-কিছু। কিন্তু এ-বিবেকও আবার পাকা হয় অভ্যাসের ফলে।

সুতরাং অভ্যাস হল সব যোগের মূল। একরকম অভ্যাসে বর্তমান জীবনটা গড়ে উঠেছে। যদি আরেকটা জীবন চাই, তাও গড়ে তুলতে হবে অভ্যাস পালটে দিয়ে। অভ্যাস থেকে তখন জ্ঞান হবে, জ্ঞান থেকে হবে ধ্যান। ধ্যানচিন্ততায় বাইরের বাঁধন আলগা হয়ে যাবে। তখন কর্ম করেও তার ফলে লোভ থাকবে না। বলতে পারব আমার যা করবার তা করলাম, এখন তাঁর যা ইচ্ছা তা-ই হ'ক। এই ভাবটি এসে গেলেই শান্তি। কুরুক্ষেত্রের মধ্যেও শান্তি। আর তাইতে ভক্তির সূচনা। তাঁর হয়ে তাঁর কাজ করা। বাইরে কাজ করা, আর অন্তরে তাঁর রসে ডুবে থাকা। যেমন তিনি আছেন—বিশ্বকর্মা হয়েও আত্মারাম।

প্রশ্ন

দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩ হইতে ১৯ শ্লোক পর্যন্ত (১২।১৩-১৯) প্রিয় ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন স্বয়ং ভগবান। গীতানুবচনে লক্ষণগুলির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিবেন কি? শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্তি অপেক্ষা, গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তির লক্ষণগুলি কি আরও অন্তরঙ্গ নহে?

উত্তর

গীতায় লক্ষিত ভক্ত জ্ঞানী। এখানে ভগবান তাঁকে 'প্রিয়' বলছেন। অন্যত্র বলেছেন চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই হলেন নিত্যযুক্ত এবং একভক্তি তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য। 'আমি যেমন তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, তেমনি তিনিও আমার প্রিয়। সব ভক্তই উদার, কিন্তু জ্ঞানীকে আমি মনে করি আমার আত্মা (৭।১৭-১৮)।'

এই ভক্তের জীবনে যোগ জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গম। যোগের একটি লক্ষণ হচ্ছে সমত্ব (২।৪৮)। ভক্তও সুখে-দুঃখে (১৩,১৮), শুভে-অশুভে (১৭), মানে-অপমানে (১৮), নিন্দাতে-স্তুতিতে (১৯), শত্রুতে-

মিত্রে (১৮) সমভাব। তিনি কোনও-কিছুর অপেক্ষা রাখেন না, কোনও-কিছুতে বিচলিত হন না, কোনও-কিছু ঘটিয়ে তোলবার আগ্রহ তাঁর নাই। তাইতে তিনি উদাসীন। আর উদাসীন বলেই তিনি আকাশের মত শুচি। অথচ তিনি নিষ্কর্মা নন—তিনি কর্মে দক্ষ (১৬) এবং সঙ্কল্পে অটুট (১৪)। কিন্তু তাঁর কর্তৃত্বের অহঙ্কার নাই বা কর্মফলের প্রতি মমতা নাই (১৩)। তাইতে তিনি যা-কিছু পান তাতেই সর্বদা সন্তুষ্ট (১৯, ১৪)।

লোকব্যবহারে তাঁর হর্ষ নাই, অমর্ষ বা অসহিষ্ণুতা নাই, ভয় নাই, উদ্বেগ নাই (১৫)। যেমন কেউ তাঁর উদ্বেগের কারণ হয় না, তেমনি তিনিও কারও উদ্বেগ সৃষ্টি করেন না (১৪)। সবার সবকিছু তিনি সয়ে যান (১৩)। এককথায় তিনি সংযতাত্মা যোগী (১৪)।

তাঁর এই যোগের পর্যবসান প্রজ্ঞাতে, তাই তিনি 'স্থিরমতি' বা স্থিতপ্রজ্ঞ (১৯)।

তাঁর প্রজ্ঞাকে মধুর করেছে তাঁর ভক্তি (১৯)। ভক্তিতে তিনি আমাতে সমর্পিতমনা, সমর্পিতবুদ্ধি (১৪)। আমি ছাড়া তাঁর আর কোনও আশ্রয় নাই (১৯)।

এই ভক্তি বিশ্বের প্রতি মৈত্রী আর করুণায় তাঁর হৃদয় ভরে তুলেছে। জগতের কাউকে তিনি কখনও বিদ্বেষের চোখে দেখেন না (১৩)।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের যে-পরিচয় পাই, এই ভক্তে তা পরিস্ফুট। গীতার ভগবান তাই বলতে পারেন, 'একভক্তি জ্ঞানীকে আমার আত্মা বলে আমি মনে করি।'

ভগবানের পরা প্রকৃতির দুটি বিভাবের কথা আগে বলেছিলাম—একটি পুং, আরেকটি স্ত্রী। গীতোক্ত ভক্তিতে ওই পৌরুষেরই বিশেষ অভিব্যক্তি। ভাগবতোক্ত ভক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে

স্ত্রীস্বভাব। অর্জুনে আর গোপীতে ভগবানের একই পরা প্রকৃতির দুটি দিক ফুটে উঠেছে—যা পরস্পরের প্রতিপূরক। তেমনি প্রতিপূরক কৃষ্ণা আর গোপালসখারা। চারটিতে মিলে ভক্তির চতুর্ব্যূহ। একটি বিভাব হতে আরেকটি বিভাবে সংক্রমণ যে স্বাভাবিক, তার প্রমাণ বিশ্বরূপদর্শনের পর অর্জুনের উক্তিতে—যখন পুরুষ হয়েও বৈদিক ঋষিদের মত ইষ্টের প্রতি তাঁর জেগেছে প্রিয়ার ভাব। গীতোক্ত ভক্তির পর্যবসান ভাগবতোক্ত প্রেমে। দুটি মিলে ভক্তির অখণ্ডৈকরসতা—সিদ্ধের জীবনে।

॥ সমাপ্ত ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

দ্বিতীয় ষট্‌ক

[৭ম হইতে ১২শ অধ্যায়]

মূল

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫
এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্‌।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াঽপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্‌ ॥ ১৮
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ ২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্‌।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অক্ষরব্রহ্মযোগঃ

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২
যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥ ২৭
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩
ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ ॥ ৪
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ততে ॥ ১০
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥২৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮
সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৩১
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্‌॥ ৩২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌॥ ৩৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ

বিভূতিযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ॥ ২
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥ ৪

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ॥ ৫
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭
অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩
সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১৭
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১৯
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬
বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮
যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০
যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে বিভূতিযোগো নামো দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যানি ভারত ॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১
দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেৎ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্
ঋষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।

বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরাঃ
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য·অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতিমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগঃ

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫
যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

পরিশিষ্ট

মূল গ্রন্থের প্রশ্নোত্তরপ্রসঙ্গে উল্লিখিত
শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার
দ্বিতীয় ষট্‌কাতিরিক্ত শ্লোকাবলী

পৃষ্ঠা	শ্লোক
১	যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৬।৪৭
২	স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব। স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ২।৫৪
৩	মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫।৭
৪	সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ১৪।৪
৪	মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ১৪।৩
৪	অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪।৬
৫	ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৩।৪০
৭	দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ১৬।৪
৭	প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ। ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ১৬।৭

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৭	অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্ । অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ১৬।৮
৭	এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ । প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ১৬।৯
৭	কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ । মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১৬।১০
৭	চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ । কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১৬।১১
৭	আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ । ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১৬।১২
৭	ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ । ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৬।১৩
৭	অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি । ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৬।১৪
৭	আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া । যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৬।১৫
৭	অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ । প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬।১৬
৭	আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ । যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৬।১৭
৭	অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ । মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৬।১৮
১৩	পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ । জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৬।৪৪
১৪	যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ । অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫।১৮
১৫	তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ১৮।৬২

পৃষ্ঠা	শ্লোক
১৬	অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্। অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৬।৩৫
১৬	উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ১৩।২৩
১৬	উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্য পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৫।১৭
২০	স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ। প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ৫।২৭
২৩	বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৪।৫
২৭	দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে। স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৪।২৮
২৭	এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে। কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৪।৩৩
২৯	পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৬।৪০
২৯	বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৪।৫
২৯	অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৪।৬
২৯	জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥ ৪।৯
৩০	সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্। বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ৬।২১
৩১	অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২।২৮
৩৩	পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু॥ ১৩।২২

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৩৩	মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫।৭
৩৩	ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৮।৬১
৩৪	অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪।৬
৩৪	যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৪।৭
৩৪	পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪।৮
৩৪	উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৩।২২
৩৪	বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ৪।১০
৩৪	নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৪।১৯
৩৪	ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ১৪।২
৩৫	অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪।৬
৪১	পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাবিধান্ পৃথগ্‌বিধান্। বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১৮।২১
৪২	সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ১৭।২৬
৪৫	যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ২।৪২
৪৫, ৪৬	কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্মফলপ্রদাম্। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য-গতিং প্রতি ॥ ২।৪৩

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৪৬	যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ। সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ৪।২২
৫১	ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ২।৪১
৫২	যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৬।৩০
৫৪	ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ৫।২৯
৫৬	মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫।৭
৫৭	নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা। ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ২।৬৬
৫৭	ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ১৩।৬
৫৮	যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্। স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮।৪৬
৫৮	ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ। তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ১৫।৪
৫৮	ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ১৩।৬
৬০	দ্রব্যযজ্ঞা স্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে। স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৪।২৮
৬০	শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৪।৩৩
৬২	যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২।৫৮

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৬৬	সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ১৪।৪
৬৭	সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫।১৫
৬৭	ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৮।৬১
৬৭, ৬৮	সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্। বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ৬।২১
৭১	প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩।২৭
৭২	দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ১।৪২
৭২	যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে। মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ১৮।৫৯
৭২	স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা। কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোহপি তৎ ॥ ১৮।৬০
৭২	ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৮।৬১
৭২	তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ১৮।৬২
৭২	সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৮।৬৬
৭২	বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ ২।৫০
৭২	যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্। স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮।৪৬

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৭২	কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ৪।১৮
৭২	ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ১৪।২
৭২	জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৪।৯
৭৪	মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫।৭
৭৮	কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ। যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ২।৭
৭৯	যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ। যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ১৮।৫
৮১	মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫।৭
৮২	জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৪।৯
৮৩	দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৫।১৬
৮৩	উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৫।১৭
৮৩	যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫।১৮
৮৩	আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্ আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২।২৯